মানবাধিকার প্রতিবেদন, বাংলাদেশ-২০১৭

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সংবিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশ জনগণের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল। ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর, ও আওয়ামী লীগের পুনঃ নির্বাচনটিতে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা এটাকে আন্তর্জাতিক নির্বাচনী মানদণ্ডের পতন ঘটেছে বলে আখ্যায়িত করেছে।

বেসামরিক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা বাহিনীর উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেঃ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলি, নির্যাতন, নির্বিচারে, বা বেআইনীভাবে আটক করা, এবং সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা গুম করে দেয়া; বাক স্বাধীনতা, প্রেস এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির (এন.জি.ও) কার্যক্রমসহ নাগরিক স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা; রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতার অভাব; দুর্নীতি; সহিংসতা এবং লিঙ্গ বৈষম্য, ধর্মীয় সম্মিলন, বর্ণ, গোষ্ঠী, আদিবাসীসহ, যৌন অভিযোজন, এবং লিঙ্গ সনাক্তকরণ'ও দেখা যায়, এর সবই হচ্ছে জবাবদিহিতা বা, দায়বদ্ধতার অভাবের কারণে। মানব পাচারের বিষয়টি গুরুতর সমস্যা হিসাবে রয়েই যায়; যেমন ছিল নিকৃষ্ট প্রকৃতির শিশু শ্রমের ব্যাপারে এবং, ছিল শ্রমিকের অধিকারের উপর বিধিনিষেধগুলি।

নিরাপত্তা বাহিনীকে অপব্যবহার করার জন্য ব্যাপকভাবে শাস্তিপ্রাপ্তদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা তদন্ত ও বিচারের জন্য সীমিত পদক্ষেপ নিয়েছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সেবাদানের প্রতি জনসাধারণের আস্থাহীনতা অনেককেই কোন অপরাধমূলক ঘটনার ব্যাপারে অবগত করায় বা সাহায্য চাইবার ক্ষেত্রে সরকারি বাহিনীগুলির কাছে যাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

বিভাগ ১। ব্যক্তি সততার প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা, উল্লেখিত বিষয়গুলিতে স্বাধীনতা সহ:

ক. বিধিবহির্ভূতভাবে জীবন থেকে বঞ্চিত করা, এবং অন্যান্য বেআইনী উপায়ে, বা রাজনৈতিক স্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে হত্যাকান্ড ঘটানো

সংবিধান জীবন-যাপনের, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করে। তবে অনেক প্রতিবেদনে পাওয়া গেছে যে, সরকার, বা তার প্রতিনিধিরা নির্বিচারে, বা বেআইনীভাবে হত্যা করেছে।

হানা, গ্রেফতার এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারীদের পরিচালিত অভিযানের সময় সন্দেহজনক মৃত্যু ঘটেছে। নিরাপত্তা বাহিনী প্রায়ই দাবি করেছিল যে , তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গভীর রাতে অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য, কিংবা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সনাক্ত করার জন্য একটি অপরাধ দৃশ্যে , বা গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা পুলিশের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল , তাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তি গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বা, অন্য কোনো পুলিশ ইউনিট , এবং অপরাধীদের দল সমূহের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের বিনিময়কে চিহ্নিত করার জন্য সরকার সাধারণত এই মৃত্যুগুলিকে "ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ড," "বন্দুকযুদ্ধে" বা "সম্মুখ যুদ্ধের, বা এনকাউন্টারে হত্যাকান্ড" বলে বর্ণনা করেছে। এগুলোকে পুলিশ বাহিনীর বৈধ ব্যবহার হিসাবে বর্ণনা করার জন্য সংবাদ মাধ্যমগুলিও কখনো কখনো এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছিল। মানবাধিকার সংগঠন ও গণমাধ্যমগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এই "ক্রসফায়ার" ঘটনাগুলিকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড হিসাবে দাবী জানিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যক্তিরা, সন্দেহভাজনদের আটক করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে, এবং নির্যাতন করার পর, তাদেরকে মূল গ্রেফতারের স্থানে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করেছে , তারপর এই হত্যাকে সহিংস আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে

এই হত্যা করতে হয়েছিল বলে বর্ণনা করেছে। একটি অভ্যন্তরীণ মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিস কেন্দ্র (আ.সা.কে), তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনী এই পর্যন্ত ১৬২ জনকে ক্রসফায়ারে হত্যা করেছে। অন্য একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা, অধিকার, জানিয়েছে যে, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বছরের প্রথম ১০ মাসে ১১৮ জনকে বিচার বহির্ভুতভাবে হত্যা করেছে।

গত ১২'ই মে'তে র‍্যাব সদস্যরা রাজবাড়ি জেলার, গোয়ালন্দ উপজেলার রাকিবুল হাসান, বাপ্পি ও লালন মোল্লাকে গুলি করে হত্যা করেছে। র‍্যাবের মতে, পূর্ববাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি নামের একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সভায়, র‍্যাব অভিযানের সময় বন্দুকযুদ্ধে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। সন্দেহভাজন এই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা দাবী করে যে, অভিযুক্ত ১২'ই মে'এর এই ঘটনাটির কয়েক মাস আগেই আইন প্রয়োগকারীরা তাকে গ্রেফতার করে আটক করে রেখেছিল। সংঘর্ষের এই পরিস্থিতিটি বিতর্কিত রয়ে যায়।

আইন ও সালিস কেন্দ্র(আ.সা.কে) বা, এ.এস.কে এই ব্যাপারে জানিয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই বছর কারাগারে আটক ৫৩ জন বন্দীকে হত্যা করেছে, যদিও 'অধিকার' তাদের প্রতিবেদনে জানায় যে, বছরের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ছয়জন বন্দীকে হত্যা করেছে।

স্থানীয় এলাকাবাসীদের নেতা মাজহারুল ইসলামের, যে কিনা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, তার পরিবার অভিযোগ করেছিল যে, র‍্যাব বাহিনী নওগাঁ জেলায় তাকে গ্রেফতার করার পর নির্যাতন করে মেরে ফেলেছিল। ইসলামের পরিবার জানায়, গত ৮'ই সেপ্টেম্বর র‍্যাব সদস্যরা সিঙ্গারহাট বাজারের একটি চায়ের দোকান থেকে তাকে গ্রেফতার করেছিল, এবং পরবর্তীতে তাকে তার বাড়িতে আটক করে রেখেছিল, যেখানে, অভিযোগ অনুযায়ি র‍্যাব সদস্যরা তাকে নির্যাতন করেছিল। পরে র‍্যাব সদস্যরা তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে, যেখানে তিনি ৯ সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করেন। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী , হাসাপাতাল জানিয়েছে যে ইসলামের দেহের বিভিন্ন অংশে একাধিক জখমের চিহ্ন

পাওয়া গিয়েছে। সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখে, ইসলামের স্ত্রী শামীমা আখতার স্বপ্না একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন, অভিযোগে তিনি কানসাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, জয়পুরহাটে র‍্যাব-৫-এর কোম্পানি কমান্ডারের, এবং অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে তার স্বামীকে নির্যাতন ও হত্যা করার অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ১৮'ই অক্টোবর তারিখে মামলার সমস্ত দলিল দস্তাবেজ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, সেজন্য ১৫'ই জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে একটি নতুন আদালতের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। স্বপ্না এবং এই মামলার একজন সাক্ষী জানিয়েছে যে, এই মামলায় তাদের ভূমিকার জন্য অজ্ঞাত মোবাইল ফোন থাকে হুমকি পেয়েছিল।

ক্ষমতাসীন দলের দলীয় চক্রগুলি এবং সদস্যদের মধ্যে স্থানীয় সরকারী দফতরগুলি পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে সহিংসতা সৃষ্টি করে, যা খুনাখুনিতে রূপ নেয়। আইন ও সালিস কেন্দ্র(আ.সা.কে) বা, এ.এস.কে'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক সহিংসতার ফলে এই বছরের প্রথম নয় মাসে ৪৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং ৩,৫০৬ জন আহত হয়েছে।

গত আগস্ট মাসে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে, ক্ষমতাসীন রাজনগর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দলের দলনেতার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে সহিংসতা সংঘটিত হয়। সংঘর্ষে ৫৬ জন আহত হয়েছেন এবং একটি যুবলীগ যুব কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

মার্চ মাসে সন্ত্রাসীরা তিনটি পৃথক সন্ত্রাসী ঘটনায় হত্যাকাণ্ড চালায় , যার সবই আই.এস.আই.এস. দ্বারা দাবি করা হয়। গত ১৭'ই মার্চ, একটি সন্দেহভাজন আত্মঘাতী বোমা বহণকারী ব্যক্তি একটি র‍্যাব ব্যারাকে ঢুকে পরে, এবং এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। গত ২৪'শে মার্চ ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গত ২৫'শে মার্চ সিলেটে সন্দেহভাজন আই.এস.আই.এস.'র নিরাপদ আশ্রয়স্থলে হানা অভিযানে আট ব্যক্তি নিহত হয়, এবং আরো ৪০ জন আহত হয়েছিল।

খ. উধাও হয়ে যাওয়া

মানবাধিকার সংস্থাগুলি, এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন প্রদানকারীরা জানায় যে, গুম হয়ে যাওয়া, এবং অপহরণ অব্যাহত আছে, কিছু কিছু ঘটছে নিরাপত্তা সেবা দানকারীদের দ্বারা। এই ধরনের কার্যকলাপগুলি প্রতিরোধ, বা তদন্ত করার জন্য সরকার সীমিত প্রচেষ্টা নিয়েছিল। অদৃশ্য হওয়ার পর , নিরাপত্তা বাহিনী কয়েকজনকে কোনো অভিযোগনামা ছাড়াই মুক্তি দেয় , কিছু গ্রেফতার করে, কিছু মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং অন্যদেরকে আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যায় নি। আইন ও সালিস কেন্দ্র(আ.সা.কে) বা, এ.এস.কে জানিয়েছে যে, এই বছর ৬০ টি উধাও বা গুম করে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

২০১৬ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তিন সাবেক বিরোধী রাজনীতিবিদদের ছেলেদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের হেফাজতে নিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে যে , তারা তাদের মধ্যে একজনের বাবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্বে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধও গঠন করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ সাত মাস পর হুমায়ুন কাদের চৌধুরীকে মুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু মীর আহমেদ বিন কাশেম, ও আমান আজমী বছরের শেষ দিন পর্যন্ত নিখোঁজ থাকে। গত ফেব্রুয়ারীতে জাতি সঙ্ঘের মানবাধিকার দপ্তর থেকে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে, অন্তত ৪০ জন নিখোঁজ রয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ দ্বারা গুম করে দেয়ার, বা বলপূর্বক অন্তর্ধানের ব্যাপারে জাতিসংঘের নির্বাহী পরিষদের কাছ থেকে বাংলাদেশ সফর করার অনুরোধটিতে সরকার কোনো সাড়া দেয়নি।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা বারবারই বলপূর্বক অন্তর্ধানের ঘটনাগুলি অস্বীকার করে আসছে, এবং দাবি করেছে যে ভুক্তভুগিরা স্বেচ্ছায় আত্নগোপন করে ছিল। জুলাইয়ের ৪ তারিখে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে প্রমানিত হয় যে, গুম বা বলপূর্বক অন্তর্ধানের ঘটনা ঘটেছে, এবং পুলিশের তদন্তকারী ব্যুরোকে এই গুম হওয়া ব্যক্তির ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

গত এপ্রিল মাসে সুইডেনের বেতারে, একজন সিনিয়র র‍্যাব কর্মকর্তা গোপনে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, সে ঐ গোপন সাক্ষাৎকারে স্বিকার করেছিল যে, তার ইউনিট নিয়মিতভাবে ব্যক্তিদেরকে তুলে এনেছিল, তাদেরকে হত্যা করেছিল এবং মৃতদেহগুলি নিষ্পত্তি, বা গুম করে ফেলেছিল।

গ. নির্যাতন, এবং অন্যান্য ধরনের নিষ্ঠুরতা, অমানবিক, বা অপমানজনক আচরণ বা শাস্তি সমূহ

যদিও দেশের সংবিধান ও আইন, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, বা অপমানজনক আচরণ বা শাস্তি নিষেধ করেছে, কিন্তু স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলি, এবং সংবাদ মাধ্যমগুলি - র‍্যাব, গোয়েন্দা সেবা এবং পুলিশের, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক কার্যকলাপ, বা অপমানজনক আচরণ বা শাস্তির পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেছে বলে প্রতিবেদন দিয়েছে। জঙ্গিদের, এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলোর সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রায়ই নির্যাতন চালায়। নিরাপত্তা বাহিনী হুমকি, মারধর, হাঁটুতে জখম করা, এবং বৈদ্যুতিক শক ব্যবহার করে এবং কখনও কখনও তারা ধর্ষণ এবং অন্যান্য যৌন নির্যাতনও করে থাকে। 'অধিকার' নামের সংস্থাটি জানিয়েছে যে, ঐ বছর, নিরাপত্তা বাহিনী, প্রায় ১২ ব্যক্তিকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে।

আইনটিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আইন প্রয়োগকারীদের হেফাজতে স্থানান্তর করার অনুমতি প্রদান করে, যা রিমান্ড হিসাবে পরিচিত, যা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সময় কোনও আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়াই ঘটতে পারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো অভিযোগ করে যে, সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে রিমান্ডে, নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটেছে।

গত ২০ শে অক্টোবর পর্যন্ত, জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই বছরে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে যৌন সুবিধা নেয়ার , ও যৌন নির্যাতনের দুটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, হাইতিতে জাতিসংঘের স্থিতিশীলতা মিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাংলাদেশী পুলিশ কর্মকর্তারা শিশুদের উপর যৌন হয়রানি করে, এবং লেনদেনের মাধ্যমে যৌন সুবিধা দাবি করে। নভেম্বর পর্যন্ত উভয় অভিযোগের তদন্তই মুলতোবি ছিল।

কারাগার এবং আটক রাখার কেন্দ্রগুলির অবস্থা

কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত কঠোর রয়ে যায়, এবং কোনো কোনো সময় অতিরিক্ত বন্দীদের চাপ, অপর্যাপ্ত সেবা, এবং যথাযথ পয়নিষ্কাশনের সল্পতার কারণে জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আইন ও সালিস কেন্দ্র(আ.সা.কে) বা, এ.এস.কে জানিয়েছে যে এই অবস্থাগুলি হেফাজতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুর কারণ হিসাবে অবদান রেখেছে, যাতে বছরে ৫৩টি মৃত্যু হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

শারীরিক অবস্থাসমূহ: কারা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, ৩৬,৬১৬ জন বন্দীর জন্য তৈরি করা ব্যবস্থাতে ৭৬,০২৫ জন বন্দীকে অবস্থান করতে হয়। কর্তৃপক্ষ প্রায়ই অভিযুক্ত বন্দীদের সঙ্গে শুনানির পূর্বের বন্দীদেরকে এক সংগে আটক রাখে।

অতিরিক্ত বন্দীদের কারণে বন্দীদেরকে পালা করে ঘুমাতে হয় , এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা ছিল না। ইন্টারন্যাশনাল কোয়াপারেশন ফর জার্মান এজেন্সির ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী কারাগারগুলি পর্যাপ্ত আলো, বায়ু, শালীনতা, এবং গোপনীয়তার ন্যুততম মানটি'ও বজায় রখতে পারেনি। গত ২০১৬ সালে মানবাধিকার সংগঠনগুলি, এবং গণমাধ্যম বলেছে যে, কিছু বন্দী চিকিৎসা সেবা, এবং পানি পায়নি, যদিও কারা কর্তৃপক্ষ জানায় যে প্রতিটি বন্দীর জন্যই পানি প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত ছিল। জেলখানায় প্রাপ্ত পানি দেশের বাকি অংশের পানির সাথে তুলনীয় ছিল, যা প্রায়ই পানযোগ্য ছিল না।

কারাগারের ভিতরের অবস্থা, এবং প্রায়ই, একই কারাগারের অংশ নিয়ে গঠিত ভবনে ব্যপকভাবে ভিন্নতা দেখা যায়। কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু কয়েদিকে উচ্চ তাপমাত্রার, অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, এবং অতিরিক্ত কয়েদিতে উপচে পরা এলাকায় রেখেছিল। আইনটি কারাগারের কর্মকর্তাদেরকে ভি.আই.পি হিসাবে মনোনিত করার অনুমতি দিয়েছিল, যাতে তারা ডিভিশন 'এ' সুযোগ সুবিধাগুলি পেতে পারে, যেখানে উন্নত থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা থাকবে, ঘন ঘন পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করার অধিকার আছে, এবং তাদের কক্ষে সাহায্যকারী হিসেবে দরিদ্র বন্দিদের কাজ করারও বিধান আছে।

আইন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদেরকে পৃথকভাবে রাখা প্রয়োজন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে অনেক কিশোরকেও আটক করে রাখে। আইন এবং আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছোটোদের কারাবাস নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও শিশুদেরকে মাঝে মাঝে (কখনো কখনো তাদের মায়ের সাথে) কারাভোগ করানো হয়।

কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে মহিলা বন্দীদেরকে পুরুষদের থেকে পৃথকভাবে রাখে। যদিও "নিরাপদ হেফাজতে" থাকা নারীদেরকে (সাধারণত ধর্ষণ, পাচার এবং গৃহে নির্যাতনের শিকার) আইনত অপরাধী নারীদের সাথে একসাথে রাখা নিষিদ্ধ করে, তা সত্ত্বেও কর্মকর্তারা সবসময় এই নারীদেরকে আলাদা সুবিধাদি প্রদান করেননি। কর্তৃপক্ষকে এই মহিলাদেরকে অবশ্যই "নিরাপদ হেফাজত" ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

যদিও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা ছিল , কিন্তু সব আটক রাখার সুবিধার যায়গায় তা ছিল না, আইন অনুযায়ী তার প্রয়োজনও হয় না। বিচারকগণ মানবিক কারনের ভিত্তিতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য শাস্তি কমাতে পারেন। কারা কর্তৃপক্ষও বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, শারীরিকভাবে অক্ষম বন্দীদেরকে কারাগারের হাসপাতালে স্থানান্তরের মাধ্যমে।

ব্যবস্থাপনা: কারাগারে কোনও ন্যায়পাল থাকে না, যার কাছে বন্দীদের অভিযোগ জমা দেওয়া যেতে পারে। কারা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে, তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক কর্মী ঘাটতি দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। পুনঃআয়োজন, বা পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল।

স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ: সরকার রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির পক্ষ থেকে পরিদর্শণ করার অনুমতি দিয়েছে।

গ. বিধিবহির্ভূত গ্রেফতার বা আটক

সংবিধানে নির্বিচারে গ্রেফতার, এবং আটক রাখা নিষিদ্ধ, কিন্তু ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে কর্তৃপক্ষ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ, বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, ও আটক করার অনুমতি পায়, যদি কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে ঐ ব্যক্তি নিরাপত্তা, এবং জনগণের শৃঙ্খলার জন্য হুমকি সৃষ্টি হতে পারে। এই ধারাটি তাদের গ্রেফতারটি যে যুক্তিসংগত এটা প্রমাণ করার জন্য আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল। সংবিধান যে কোনো ব্যক্তিকে আদালতে তার গ্রেফতার বা আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার প্রদান করে, তবে সরকার সাধারণত এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পালন করে নাই। গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি সরকারকে শুধু সন্দেহভাজন জঙ্গীদের বিরুদ্ধেই নয়, বরং সুশীল সমাজ ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধেও বলপ্রয়োগ করে উধাও করে দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও তাদের অবস্থান বা পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিবার বা আইনী পরামর্শ দাতাকে কিছুই জানতে দেয়না, বা প্রথমে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার কথাই স্বীকার করে না।

পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ভুমিকা

বাংলাদেশ পুলিশ, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন, তারা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর

অনেকগুলি ইউনিট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দায়িত্বের আওতায় কাজ করে। এই ধরনের ইউনিটগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইউনিটগুলি হল কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স-ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সি.টি.টি.সি.ইউ), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) - বেশিরভাগই সন্ত্রাসবিরোধী প্রাধান্য দেয়ার বিশেষ মিশন, এবং গোয়েন্দা শাখা।

সেনাবাহিনী, যা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি জবাবদিহি (যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদাধিকারীও), বহিরাগত হুমকির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য দায়ী। বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের প্রয়োজন হলে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বগুলির সাথে সামরিক ব্যবস্থাগুলিকেও "সক্রিয়" করা যেতে পারে। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে সন্ত্রাসের ঘটনাগুলির সময় সাড়া দেয়া।

ডাইরেক্টর জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডি.জি.এফ.আই.) এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা'র (এন.এস.আই), একই কাজ, এই দুই প্রধান গোয়েন্দা সংস্থাকে ওভারল্যাপিং করে দায়িত্ব পালন করার সক্ষমতা হয়েছে। এদের উভয়ই অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী বিষয়গুলির জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি জবাবদিহিতা করার দায়িত্বে থাকবে। মিডিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডি.জি.এফ.আই এবং কিছুটা কম মাত্রায় এন.এস.আই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানবাধিকারের লঙ্ঘনের সাথে জড়িত। এই লঙ্ঘন অন্তর্ভুক্ত আছে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, বিরোধী দলগুলোর সদস্যদের বিরুদ্ধে, নাগরিক সমাজ, এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে।

বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক বাহিনী এবং, নিরাপত্তা বাহিনীর উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। যদিও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যকার অপব্যবহার এবং দুর্নীতির তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা সরকারের কাছে আছে, তবে এই প্রক্রিয়াগুলি নিয়মিতভাবে কাজে লাগানো হয়নি। দুর্নীতি কমিয়ে আনতে সরকার পুলিশের পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতা বাড়াতে পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। কমিউনিটি ভিত্তিক পুলিশী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে

পুলিশের মৌলিক প্রশিক্ষণে বাহিনীটি দ্বারা যথাযথভাবে বল প্রয়োগ করার ওপর নির্দেশনাগুলি অন্তর্ভুক্ত রেখেছে।

পুলিশের বিধি অনুযায়ী, পুলিশের দ্বারা বল প্রয়োগ করা সবগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা যার কারণে গুরুতর শারীরিক আঘাত বা মৃত্যু ঘটেছে, এমন সব কর্মকান্ডে, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়ে যায়, যা সাধারণত একটি পেশাদারী মানের ইউনিটের মাধ্যমে করা হয়, যারা সরাসরি পুলিশের মহাপরিদর্শককে জবাবদিহি করে। যদিও উর্ধতন কর্মকর্তারা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, সরকার এই ব্যাপারে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি অনুসরণ করবে, এবং ২০১৬ সালে ঘটে যাওয়া নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা অভিযুক্ত প্রতিটি বিচার বহির্ভুত হত্যার পূর্ণ তদন্ত করবে , কিন্তু সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা হত্যার মোট পরিসংখ্যানটিও প্রকাশ করেনি, এবং এই মামলাগুলির তদন্ত করার ব্যাপক কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি। ২০১৬ সালে মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই মূল্যায়ন পরিচালনার পেশাদার ইউনিটের মানের এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। এরকম জ্ঞাত কিছু ঘটনায় যেখানে সরকার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, তাদের মধ্যে যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তাদেরকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

নিরাপত্তা বাহিনী দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার চালিয়ে যেতে থাকে। অভিযোগকারী ফৌজদারী মামলায় দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার কারণে এবং প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার ভয়ে পুলিশকে দোষারোপ করতে অনিচ্ছুক ছিল। পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না করার কারনে, একটা অব্যাহতি পাওয়ার অনুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি অনুগত কর্মকর্তারা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সরকার মানবাধিকার অপব্যবহারের মামলার তদন্তকারী সেল দ্বারা, র‍্যাব-এর অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণ তদন্ত পরিচালনা করার সমর্থন করাকে অব্যাহত রেখেছে।

র‍্যাব তাদের উদ্ঘাটিত তথ্যগুলি ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেনি, এবং মানবাধিকারের অপব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়নি।

নিরাপত্তা বাহিনী সামাজিক সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে (অধ্যায় ৬ দেখুন)।

আটক করার পদ্ধতি এবং, বন্দীদের সাথে আচরণ

সংবিধান দাবী করে যে গ্রেফতার এবং আটকাদেশ একটি ওয়ারেন্ট দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, বা একটি অপরাধ সংঠিত হওয়ার সময় কাউকে অপরাধ করতে দেখার ফলে ঘটতে পারি, কিন্তু ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন, এই সুরক্ষার ব্যাপক ব্যতিক্রমগুলি প্রদান করে।

সংবিধানের অধীনে বন্দীদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগের সম্মুখীন করার জন্য একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সামনে হাজির করা উচিত, কিন্তু এটা নিয়মিতভাবে পালন করা হয়নি। সরকারি বা একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে ৩০ দিনের জন্য আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারে যদি সে এমন কোন কাজে লিপ্ত হয় যা কি-না জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে; যাইহোক, কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও আটক ব্যক্তিকে তার অব্যাহতির আদেশ থাকা সত্ত্বে ও দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক করে রেখে দিয়েছিল।

একটি কার্যকর জামিন দেয়ার পদ্ধতি চালু আছে, কিন্তু পুলিশ নিয়মিতভাবে নিজেরাই দায়মুক্ত থেকে যাচ্ছে, জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর, আদালতে হাজির না করে, কাউকে নতুন মামলায় পুনরায় গ্রেফতার করা যাবে না মে ২০১৬’র সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের এরকম নির্দেশনা থাকা সত্বেও তারা এভাবে গ্রেফতার করে।

কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদেরকে কেবল আদালতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করার পর তাদেরকে মক্কেলদের সাথে দেখা করার

অনুমতি দেয়, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক গ্রেফতার হওয়ার কয়েক সপ্তাহ, বা মাস পরেও ঘটতে দেখা গেছে। বন্দীদের বৈধভাবে পরামর্শ পাওয়ার অধিকার আছে, এমনকি যদি তারা এটার জন্য অর্থ প্রদান করতে না পারে, তবে এই অধিকারটি দেয়ার জন্য দেশটির পর্যাপ্ত অর্থের অভাব রয়েছে।

<u>বিধিবহির্ভূত গ্রেফতারঃ</u> বিধিবহির্ভূত গ্রেফতার ঘটে, প্রায়ই রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময়, বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর সাড়াদানকালে, এবং নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়াই সরকার লোকজনদের আটক করে রাখে, মাঝে মাঝে অন্য সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিস্তৃতিটি গ্রেফতারের জন্য এমন একটি আইনি যুক্তি প্রদান করে , যা প্রায়ই অন্য দৃষ্টিকোন থেকে বিধিবহির্ভূত হিসাবে বিবেচিত হবে, যেহেতু এটা এই প্রয়োজনীয়তাটাকে অপসারণ করে যে গ্রেফতারটি সেই অপরাধগুলির জন্য করা হয়েছে যেগুলি ঘটেছিল পূর্বেই। বিগত বছর থেকে ভিন্ন, যখন পুলিশ গণ-গ্রফতারের জন্য মাঠে নামলো, তখন ২০০০ অতিরিক্ত বিরোধী দলীয় কর্মী সহ, প্রায় ১৪,০০০ সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করেছিল, সেই বছর বিভিন্ন অভিযোগ দেখিয়ে বিরোধিদলীয় নেতাদেরকে প্রায়ই গ্রেফতার করেছিল।

<u>বিচার-পূর্ব আটকাবস্থাঃ</u> বিধিবহির্ভুত এবং দীর্ঘকালীন বিচার-পূর্ব আটকাবস্থা অব্যাহত থাকে আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, সীমিত সম্পদ, বিচার-পূর্ব আটক রাখার বিধির শিথিল প্রয়োগ, এবং দুর্নীতির কারণে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার-পূর্ব আটক রাখার সময়কালটি অপরাধের জন্য প্রাপ্ত সাজার কালের সমান হয়ে যায় কিংবা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল।

<u>আদালতের সামনে বন্দীদের আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতাঃ</u> একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ১৫ দিনের মধ্যে বন্দীকে আটক রাখার জন্য কারণটি জানাতে হবে। বিধি অনুযায়ী একটি পরামর্শদানকারীর বোর্ড প্রয়োজন, সরকার দ্বারা নিযুক্ত দুইজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত যাদের হাই কোর্টে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং একজন "জেষ্ঠ

কর্মকর্তা প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োজিত" চার মাস পরে বন্দীর মামলাটি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। আটক ব্যক্তিদের আপীল করার অধিকার আছে।

অসংখ্য শূন্য পদ থাকার কারণে আইনী চ্যালেঞ্জগুলি করার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত করে। গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর ডেইলি স্টার সংবাদপত্রটি বিচারকদের নিয়োগে বিলম্বের কথা বলেছে, যা বিচারিক কার্যধারা ব্যাহত করছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার কাজগুলো জমা হয়ে থাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ৫১ জন জেলা বিচারক সহ নিম্ন আদালতের বিচারকদের মোট ৩৯৭ টি পদ শূন্য রয়েছিল। ২০ লক্ষ ৭০ হাজারও বেশি মামলা নিম্ন আদালতে বিচারাধীন ছিল, এবং সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ছিল ৪০০,০০০ টি মামলা বিচারাধীন।

ঘ. ন্যায্য প্রকাশ্য বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া

আইনটি করা হয়েছিল একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রদান করার জন্য, কিন্তু দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে তার স্বাধীনতা খর্ব হয়। ২০১৪ সালে সংসদ ১৬ তম সংশোধনী পাশ করে, এতে সংসদ বিচারকদেরকে অপসারণ করার অধিকার অর্জন করে। একই বছরে সুপ্রিম কোর্ট সংশোধনীটিকে অসাংবিধানিক বলে মতামত দেয়, এবং প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সংসদ এবং প্রধানমন্ত্রীর খোলাখুলিভাবে মতবিরোধ দেখা দেয়, এর ফলে প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগ করতে হয়, এবং দেশ থেকে প্রস্থান করতে হয়। প্রধান বিচারপতি দাবি করেন যে, সরকার তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, যদিও সরকার তার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সরকার ঐ বছরে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে, যা মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা এই অভিযোগটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছিল।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে ম্যাজিস্ট্রেটরা, উকিলরা এবং আদালত কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে আসামিদের কাছ থেকে ঘুষের দাবি করে, অথবা তারা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে , বা আনুগত্যের উপর

ভিত্তি করে রায় দেয়। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে বিচারকদের যারা সরকারের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তারা অন্যান্য বিচারব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে। জানা গেছে, কিছু কিছু কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের পক্ষ নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করা থেকে আইনজীবীদেরকে নিরুৎসাহিত করেছে।

দুর্নীতি এবং অনেক মামলা জমে থাকা, আদালত ব্যবস্থায় বাঁধা সৃষ্টি করেছে, এবং অব্যাহতভাবে মামলার শুনানির তারিখ বর্ধিত করায় অনেক আসামি ন্যায্য বিচার লাভে বাধা প্রাপ্ত হয়।

বিচার কাজের পদ্ধতি সমূহ

সংবিধান একটি ন্যায্য, এবং প্রকাশ্য বিচার কাজ পরিচালনার অধিকার প্রদান করে, কিন্তু বিচার বিভাগের দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্বল জন সম্পদ, ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার কারণে এই অধিকারকে সর্বদা রক্ষা করা যায় না।

অভিযুক্তদেরকে নির্দোষ বলে ধরে নেয়া হয়, আপিল করার অধিকার আছে, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অবিলম্বে এবং বিস্তারিতভাবে জানার অধিকার আছে। অভিযুক্তদের আদালতের মামলায় উপস্থিত থাকার অধিকার আছে। সামর্থহীন অভিযুক্তদের সরকারী উকিল বা ডিফেন্ডার পাওয়ার অধিকার আছে। মামলার শুনানি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হয়। যে সব অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলা বুঝে না, এবং বলতে পারে না সরকার তাদের জন্য বিনা পয়সায় দোভাষী প্রদান করে না। অভিযুক্তদেরও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে মামলার বিরুদ্ধে, বা বাদির সাক্ষীদের মুখোমুখি হওয়ার অধিকার আছে, এবং তাদের নিজস্ব সাক্ষী এবং প্রমাণ উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে। তাদেরকে যাতে জোর জবরদস্তী করে স্বীকারোক্তি নেয়া না হয়, বা দোষী সাব্যস্ত করা না হয় সেই অধিকারও তাদের আছে, যদিও যেসব অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে না, তাদেরকে প্রায়ই আইনের হেফাজতে রাখা হয়। সরকার প্রায়ই এই অধিকারগুলিকে মান্য করেনি।

নির্বাহী শাখার ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্টগুলি তাৎক্ষণিক রায় প্রদান করে যেখানে প্রায়ই অভিযুক্তের কারাভোগের সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু সেখানে অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনী প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকে না। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে, ঢাকায় জেলা প্রশাসকদের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে ৬৪ টি জেলার থেকে আসা জেলা প্রশাসকরা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০০৯ সালের ভ্রাম্যমান আদালত আইনের সংশোধনী পাস করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানায়, কিন্তু সংসদ এই ধরনের আইন বছরের শেষ পর্যন্ত সংসদে উত্থাপনই করেনি। এই বিষয়ে, গত মে মাসে হাইকোর্টের রায় ছিল যে, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতায় ক্ষমতায়ন করা "বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর একটি মুখোমুখি আক্রমণ, এবং এটা ক্ষমতার বিভাজন মতবাদটিকে লঙ্ঘন করে।" সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল প্যানেলের মাধ্যমে আপিল করেছিল, যেখানে এই রায়টি বলবত রাখা হয়, তবে আপিল প্যানেলের পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মোবাইল কোর্টের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

রাজনৈতিক বন্দী এবং বন্দীরা

রাজনৈতিক বন্দী, বা বন্দীদের ব্যাপারে প্রতিবেদন ছিল। বিরোধী দলের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করা, এবং মামলায় মুখোমুখি করার জন্য রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা একটি ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে, এতে জাতীয় নিরাপত্তার হুমকির কারণে সাড়া দেয়ার বাহানা দিয়ে মিথ্যা সাজানো অভিযোগের মামলাও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) বলেছে যে তাদের সদস্যদেরকে বিধিবহির্ভুতভাবে ইচ্ছামত গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো উদাহরণ দিতে পারেনি।

দেওয়ানী বিচার পদ্ধতিগুলি, এবং প্রতিকার সমূহ

মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি আইনগত প্রতিকার চাইতে পারে; যাইহোক, আদালত ব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থার অভাব থাকায় অভিযোগ জমা দেয়া থেকে অনেককে দূরে রাখে। যদিও আইনে ন্যায়পালের একটি বিধান আছে, এই বিধানটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি।

সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ

প্রাথমিকভাবে হিন্দুদের জমি দ্রুত ফেরৎ দেয়ার জন্য সরকার ২০০১ সালের সম্পত্তি ফেরৎ দেয়ার প্রক্রিয়ার আইনটিকে সংশোধন করেনি (অধ্যায় ২.ঘ দেখুন) এই আইনটি সরকারকে রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণাকৃত ব্যক্তির সম্পত্তিগুলি জব্দ করার সুযোগ দেয়। এই আইনটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছিল, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলিকে জব্দ করা হয়েছিল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক জমির মালিকদেরকে সামঞ্জস্যহীনভাবে স্থানান্তর করায়, তারা অব্যাহতভাবে মালিকানাবিরোধী দ্বন্দ্বের ব্যাপারে প্রতিবেদন দিয়ে আসছিল, বিশেষ করে নতুন সড়ক বা শিল্প উন্নয়ন অঞ্চলগুলির নিকটবর্তী এলা কার ক্ষেত্রে, যেখানে জমির দাম বেড়ে গিয়েছে। তারা দাবি করে যে স্থানীয় পুলিশ, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, এবং রাজনৈতিক নেতারা নিজেরাই কখনও কখনও উচ্ছেদ কর্মকান্ডে জড়িত হয়, কিংবা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ভূমি দখলকারীকে আইনি বিচারের সম্মুখিন হওয়া থেকে রক্ষা করে (অধ্যায় ৬ দেখুন)। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য ভূমি পুনরুদ্ধারের অনুমতি দিতে পারে (অধ্যায় ২.ঘ দেখুন)।

চ. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পারিবারিক, গৃহের, বা যোগাযোগ মাধ্যমের উপর নির্বিচারে বা বেআইনী হস্তক্ষেপ

আইন ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সাথে মনুষ্য হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে না। গোয়েন্দা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির সাপেক্ষে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলি নিরীক্ষণ করতে পারে, তবে পুলিশ খুব কমই আদালতের কাছ থেকে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের নজরদারি করার অনুমতি নেয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলি অভিযোগ করেছিল যে, পুলিশের বিশেষ শাখা, জাতীয় নিরাপত্তার গোয়েন্দা বিভাগ, এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স, যেসব নাগরিক সরকারের সমালোচনা করে বলে ধারণা করা হয়, তাদেরকে নজরদারীতে রাখার জন্য তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করেছিল।

এরকম অন্তত তিনটি ঘটনা ছিল যেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সন্তানরা, তাদের আত্মীয়দের দ্বারা সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য গ্রেফতার হয়েছিল (অধ্যায় ১.খ দেখুন)।

অধ্যায় ২. নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান, যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে :

ক. সংবাদপত্র সহ, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

সংবিধান সংবাদপত্র সহ বাক স্বাধীনতা প্রদান করে, কিন্তু সরকার কখনও কখনও এই অধিকারকে সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা ছিল। কিছু কিছু সাংবাদিক হয়রানি, এবং প্রতিশোধের ভয়ে সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে নিজেই নিজের লেখাকে কাট-ছাট করেছিলেন।

<u>মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ</u> সংবিধান, সংবিধানের সমালোচনা করাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসাবে বিবেচনা করে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে। ২০১৬ সালে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব মাহমুদুর রহমান মান্না এবং প্রতিবেদক কনক সারোয়ারসহ অনেক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সরকার মান্না ও সারওয়ারের বিচার চালিয়ে যায়নি। আইনটি ঘৃণামূলক বক্তব্যকে সীমিত করে দেয়, কিন্তু স্পষ্ট করে ব্যাখ্য করে না যে, ঘৃণামূলক বক্তব্য

কীভাবে গঠন করা হয়, যা কিনা সরকারকে এই আইনটিকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়। সরকার এই বক্তব্যকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বক্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, বিদেশী কোনো দেশের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কের বিরুদ্ধে বক্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, গণ শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে, শালীনতার বিরুদ্ধে, নৈতিকতার বিরুদ্ধাচারণ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে; কিংবা আদালত অবমাননা করা, মানহানি বা, কোনো অপরাধ করায় কাউকে উৎসাহিত করার বক্তব্য হিসাবেও তুলে ধরতে পারে। বিদেশী অনুদানের ধারাটি দ্বারা , কোনো সাংবিধানিক সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনাকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে। ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (আই.সি.টি.এ.)-এর ৫৭ ধারায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মানহানির কথা উল্লেখ করা আছে, এবং এটাকে বিরোধী দলীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, ও নাগরিক সমাজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

<u>সংবাদ পত্র ও সংবাদাধ্যমের স্বাধীনতাঃ</u> প্রিন্ট এবং অনলাইন স্বাধীন মিডিয়া উভয়ই সক্রিয় ছিল, এবং বিভিন্ন ধরণের মতামত প্রকাশ করেছিল; যাইহোক, সংবাদ মাধ্যমগুলি, যারা সরকারের সমালোচনা করেছিল, তাদের সরকারের দিক থেকে নেতিবাচক চাপের অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশন স্টেশনের (বি.টি.ভি)উপর সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ রাখে, এবং বেসরকারী চ্যানেলগুলিকে কোন মূল্য ছাড়াই সরকারি প্রচার সামগ্রী সম্প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছে। নাগরিক সমাজ বলেছে যে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে, কারণ ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন দেয়া স্টেশনগুলিকেই সরকার টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্সগুলির বরাদ্দ দিয়েছিল।

<u>সহিংসতা এবং হয়রানিঃ</u> কোন কোন ক্ষেত্রে গোয়েন্দা পরিসেবা দানকারী সংস্থাগুলি, এবং কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিকদের উপর শারীরিক আক্রমণ, হয়রানি, এবং ভীতি প্রদর্শন করেছিল।

গত অক্টোবরে উৎপল দাস নামের অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের একজন সাংবাদিক উধাও হয়ে গিয়েছিল, এবং ডিসেম্বর মাসে পুনরায় ফিরে এসেছিল। ফেরার পর দাসকে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিতে দেখা যায়, এবং পর্যবেক্ষকরা অভিযোগ করেন যে, তাকে ভয় দেখানোর পদ্ধতি হিসেবে জোরপূর্বক অদৃশ্য করা হয়েছিল। মুবাশ্বের হাসান নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যিনি, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি ঐ বছর ৪৪ দিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। 'দ্য অয়্যার' নামের একটি সংবাদ ওয়েবসাইট, এইভাবে উধাও করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করে অভিযোগ করার পর, সরকার 'দি অয়্যারের ওয়েবসাইটে' সবার জন্য অ্যাক্সেস বা প্রবেশ করা বন্ধ করে দিয়েছিল।

কমিটির তথ্য অনুযায়ী সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য , গত ১৭'ই মে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশে অবস্থানরত সব দূতাবাসগুলিতে নির্দেশ দিয়ে পত্র পাঠানো হয়, যাতে বাংলাদেশী সাংবাদিক যারা বিদেশ ভ্রমণে যাবে তাদের দিকে নজর রাখা হয়।

পত্রটিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল , যেখানে ভ্রমণকারী সাংবাদিকরা "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিচ্ছিল" বলে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ।

<u>সেন্সরশিপ কিংবা বিষয়বস্তুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাঃ</u> স্বতন্ত্র সাংবাদিকরা অভিযোগ করেন যে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আর্থিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করে, এবং ব্যক্তিগত কোম্পানীগুলিকে তাদের বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, যা প্রচার মাধ্যমগুলিকে আংশিকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ব্যক্তি মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি সাধারণত স্বাধীনভাবে ভিন্ন মতামত প্রকাশ করার সুবিধা ভোগ করেছে । রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং স্ব-সেন্সরশিপ একটি সমস্যা,

তবে- বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ রেখে প্রচার মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার বিজ্ঞাপন প্রচারকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।

সরকারের সমালোচনা করেছে এমন সংবাদ মাধ্যমকে শাস্তি দিয়েছে। একাধিক অনুষ্ঠানে, সরকারি কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেলগুলিকে হুমকি দেয়, যাতে তারা বিরোধী দলের কার্যক্রম এবং বিবৃতিগুলি প্রচার না করে। পর্যবেক্ষকদের মতে দৈনিক সংবাদপত্র *প্রথম আলো* এবং *ডেইলি স্টার'কে* প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি, কারণ তারা সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সরকার ক্ষমতাসীন দলের জন্য ক্ষতিকর বলে গণ্য প্রতিবেদনগুলি দমন করার জন্যেও হস্তক্ষেপ করেছিল। গত ২২ শে সেপ্টেম্বর, বার্মা নিউজ পোর্টাল *মিজিমা ডট-কম'এ* "বাংলাদেশের হাসিনা আরেকটি আক্রমণ থেকে জীবনে বেঁচে গেল" এরকম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল ভারতীয় পত্রিকার এক সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক। গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় টেলিভিশন স্টেশন যমুনা টিভি ও ডি.বি.সি নিউজ প্রতিবেদনটিকে ব্রেকিং নিউজ বলে প্রচার করে, কিন্তু এটার প্রচারটি বন্ধ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

কিছু সাংবাদিক ও মানবাধিকার এন.জি.ও. গুলোর মতে, যে সব সাংবাদিক স্ব-সেন্সরশিপের সাথে জড়িত, তারা বিশেষত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিশোধের ভয়েই এটা করছে। যদিও সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সমালোচনা, এবং কণ্ঠস্বর প্রচলিত খুব সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের কিছু ব্যক্তিত্ব তাদের উপর সরকার দ্বারা হয়রানির ভয় প্রকাশ করে।

কিছু আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম, তাদের ভিসা প্রাপ্তিতে বিলম্ব এবং সমস্যার কথা জানিয়েছে। একটি সরকার পরিচালিত সিনেমার সেন্সরশিপ বোর্ড, যা স্থানীয় ও বিদেশী চলচ্চিত্রগুলিকে পর্যালোচনা করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশ্লীলতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মানহানি, বা রচনা চুরির ঘটনার

ভিত্তিতে সিনেমার নিষেধাজ্ঞা বা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু এটা অতীতের তুলনায় কম কঠোর ছিল।

বার্মার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রধান সংবাদ সংস্থাগুলি সহ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবেদন লিখতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও দুইজন বর্মী চিত্র সাংবাদিককে গত সেপ্টেম্বর মাসে আটক করা হয়েছিল, এবং গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের অনেক সদস্যই পর্যটকের ভিসা নিয়ে দেশে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু সাংবাদিক ভিসার পরিবর্তে দেশে প্রবেশ করার জন্য পর্যটন ভিসা ব্যবহারের জন্য চিত্র সাংবাদিকদেরকে পুলিশ আটক করেছিল । সাংবাদিকরা দুই সপ্তাহ আটক থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু চার সপ্তাহ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অভিযোগ প্রত্যাহার না করাতে তারা দেশ ছেড়ে যেতে পারেনি।

বেসরকারি প্রভাবঃ নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমকামী নারী, সমকামী পুরুষ, উভকামী, হিজড়া, এবং উভলিঙ্গ (LGBTI) লেখক এবং ব্লগাররা জানিয়েছে যে, তাদের সহিংস চরমপন্থী সংগঠনগুলি থেকে মৃত্যুর হুমকি পাওয়া অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বর মাসে একজন মানবাধিকার আইনজীবী দাবি করেন যে তিনি দেশের এল.জি.বি.টি সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য লেখার কারণে এবং তাদের পক্ষসমর্থন করার কারণে লিখিতভাবে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি পেয়েছেন।

ইন্টারনেটের স্বাধীনতা

সরকার ইন্টারনেট ব্যবহার সীমিত করেছিল এবং হস্তক্ষেপ করেছিল, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অনলাইনের বিষয়বস্তুগুলিকে সেন্সরও করেছিল। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) জানিয়েছে যে, আগস্ট মাসে আনুমানিক ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ভোক্তা ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, যার মধ্যে আনুমানিক ৭ কোটি ১০ লক্ষ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে (এক

ব্যক্তির একাধিক সাবস্ক্রিপশন থাকতে পারে)। সরকার ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, এবং ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিফোনি নিষিদ্ধ করেছিল কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাটি কদাচিৎ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

বিভিন্ন ঘটনায় সরকার ইন্টারনেট যোগাযোগ, ফিল্টার করেছে বা ব্যবহারে বাধা দিয়েছে, বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ করেছে, এবং ওয়েবসাইট সেন্সর করেছে, বা অন্যান্য যোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সেবাগুলিতে হস্তক্ষেপ করেছে। একটা অস্পষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে অনেক ওয়েবসাইট স্থগিত বা বন্ধ করা হয়েছিল, কিংবা তাদের বিরোধীদের-পক্ষের বিষয়বস্তুগুলিকে সুস্পস্টভাবে উল্লেখ করেছে যা কিনা আইনি প্রয়োজনীয়তাগুলির লঙ্ঘন ছিল।

বিটিআরসি'কে টেলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটা সরকার, এবং আইন প্রয়োগকারীদের অনুরোধ পালন করে, এবং ইন্টারনেট সেবাদানকারীদেরকে বিষয়বস্তুগুলিকে আটকে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আদেশ দেয়

সরকার জাতীয় ঐক্য, এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য যে বিষয়বস্তুগুলিকে ক্ষতিকারক বলে মনে করে, বি.টি.আর.সি. সেই ইন্টারনেট বিষয়বস্তুগুলিকে ফিল্টার করে। আগস্ট ২০১৬ সালে বি.টি.আর.সি ৩৫ টি সংবাদ ওয়েবসাইটকে ব্লক করার নির্দেশনা পালন করে, যা সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনামূলক বিষয় প্রকাশ করেছে, বা রাজনৈতিক বিরোধী দলের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন প্রদানের কথা বলেছিল। অনেকগুলো সাইট আজও অবরুদ্ধ রয়েছে।

আই.সি.টি.এ. অনুচ্ছেদ ৫৭ অনুযায়ী রাষ্ট্র বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী, বা অসম্মানজনক তথ্য পোস্টিং করা অপরাধ। এই আইনের প্রতিবাদকারীরা বলছেন যে, অসাংবিধানিকভাবে বাক স্বাধীনতাকে জব্দ করা হয়েছে। সরকার অনলাইনের কর্মতৎপরতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য

আই.সি.টি.এ. এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার হুমকিটি ব্যবহার করেছিল, যা সম্ভাব্য মৃত্যুদন্ড বহন করে।

ডেইলি স্টারের একটি তদন্তের ভিত্তিতে, মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত আই.সি.টি.'র ৫৭-ধারায় ১১ টি মামলায় সরকার কমপক্ষে ২১ জন সাংবাদিককে বিচার করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমূহ

যদিও সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপর কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে এমন সংবেদনশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়গুলির উপর গবেষণা নিরুৎসাহিত করেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকাশিত প্রকাশনাগুলিও তদন্ত ও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগগুলিও রাজনৈতিক সংহতির উপর ভিত্তি করে চলতে থাকে।

খ. শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সংঠন করার স্বাধীনতা

সংবিধান শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা প্রদান করে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা ছিল।

শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করার স্বাধীনতা

আইন শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রদান করে, কিন্তু সরকার এই অধিকার সীমিত করেছে। আইনটি চার ব্যক্তির বেশি সদস্যের সভাগুলি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারকে বিবেচনা করার ব্যাপক একটি অধিকার দিয়েছে। ঢাকায় বিক্ষোভ ও বিক্ষোভ সমাবেশের জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছ থেকে আগাম অনুমতি প্রয়োজন হয়। মানবাধিকার এন.জি.ও'গুলির মতে, কর্তৃপক্ষ বিরোধীদলীয়

দলগুলোর দ্বারা সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ার জন্য অনুমোদন প্রথাটি ব্যবহার করে চলেছে। মাঝে মাঝে, পুলিশ বা ক্ষমতাসীন পার্টির কর্মীরা বিক্ষোভ ছত্রভংগ করে দিতে বল প্রয়োগ করে।

এই বছর, পুলিশ একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যদেরকে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১ লা মে তারিখে শ্রম দিবসকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, ঢাকায় প্রধান বিরোধী দল, বিএনপি'র শ্রম কমিটির সমাবেশের জন্য পুলিশ অনুমতি দেয়নি, অথচ সরকারের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোকে জনসম্মুখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামি, একটি এনজিও, যারা একসময় রাজনৈতিক দল ছিল তার সদস্যদেরকে সাক্ষাৎ করার জন্য, ব্যক্তি পর্যায়ে, এমনকি ঘরোয়া মিটিং'এর অনুমতিও দেয়নি পুলিশ। গত অক্টোবরের ৯ তারিখে, ঢাকার উত্তরা এলাকার একটি বাড়ি থেকে জামাতের আমীর (প্রেসিডেন্ট), উপ-আমির এবং সেক্রেটারি জেনারেলসহ মোট ৯ জনকে আটক করে পুলিশ। তারা দাবি করে যে তারা দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পরিকল্পনা করছিল।

সমিতি করার স্বাধীনতা

নৈতিকতা বা জন-শৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ" সাপেক্ষে, সংগঠন বা সমিতি গঠনের জন্য আইনটি নাগরিকদেরকে অধিকার প্রদান করে, এবং সরকার সাধারণত এই অধিকারটির প্রতি সম্মান দেখায়। সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কখনও কখনও সংবেদনশীল বলে বিবেচিত হয় এরকম এলাকাগুলোতে কাজ করে এরকম এন.জি.ও'গুলির জন্য বিদেশী অর্থায়নের অনুমোদন বন্ধ রাখে, যেমন, মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, আদিবাসী অধিকারের এলাকাগুলিতে, কিংবা মানবিক সাহায্যের রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের এলাকায় (বিভাগগুলি দেখুন ২.ঘ, ৫ এবং ৭.ক)।

২০১১ সালের বৈদেশিক দান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন অ্যাক্টটি, এন.জি.ও. বা সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা বিদেশী তহবিলের প্রাপ্তির জন্য বাড়তি সীমাবদ্ধতা

যোগ করেছে, এবং এন.জি.ও.গুলিকে সংবিধান, বা সাংবিধানিক সংস্থাগুলির (৫ অধ্যায় দেখুন) বিষয়ে কোন "অসম্মানজনক" মন্তব্য করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছে। পরবর্তীকালে সরকার ঘোষণা করে যে, বেশ কয়েকটি এনজিও দেশে তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে না, এতে অন্তর্ভুক্ত আছে মুসলিম এইড বাংলাদেশ, ইসলামিক রিলিফ, এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, যদিও সংবাদ মাধ্যমগুলি্র প্রতিবেদনে, নিষিদ্ধ করার পিছনে বিশেষভাবে বিদেশী দান আইনটি ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।

গ. ধর্ম পালনের স্বাধীনতা

www.state.gov/religiousfreedomreport/'এ দেয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের *ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম রেপোর্টটি* দেখুন।

ঘ. চলাচল করার স্বাধীনতা

আইনটি অভ্যন্তরীণ চলাচলের, বিদেশে ভ্রমণ, অভিবাসন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য স্বধীনতা প্রদান করে, এবং সরকার সাধারণত সি.এইচ.টি ও কক্সবাজার এই দুইটি সংবেদনশীল এলাকা ছাড়া, এই অধিকারগুলির প্রতি সম্মান দেখায়। বিদেশিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের ওপর সরকার কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

অগাষ্টের ২৫ তারিখ থেকে দেশটি ৬৪৬০০০ হাজারেরও বেশী বার্মা থেকে আসা রোহিঙ্গা অভিবাসীদের আগমনের অভিজ্ঞতা নিতে থাকে, বর্তমানে উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করা সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুন সংখ্যার কাগজপত্রহীন শরনার্থী বার্মা সীমান্তে কক্সবাজার ক্যাম্পে আসে, এবং অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে।

ঐ বছর জাতিসঙ্ঘ হাইকমিশন ফর রেফিউজি'র (ইউ.এন.এইচ.সি.আর.) অফিসের সাথে, এবং অন্যান্য মানবতার জন্য কাজ করা সংস্থাগুলি, যারা রেফিউজি'দেরকে, রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে, এবং যারা দেশহীন ও, অন্যান্য উদ্বেগের কারণ হওয়া মানুষগুলির জন্য সুরক্ষা ও সহায়তা দিচ্ছে, তাদের

সাথে সরকারের সহযোগিতা করার রেকর্ডটি ছিল মিশ্র প্রকৃতির/ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকার বছরের প্রথম আট মাসে ইউ.এন.এইচ.সি.আর'কে মাত্র ৩৩,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছে যাওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল, এবং ইউ.এন.এইচ.সি.আর'কে অ-নথিভুক্ত প্রায় ২০০,০০০-৫০০,০০০ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছে যাওয়ার জন্য বা তাদের তথ্যগুলি পেতে আগস্ট পর্যন্ত অনুমতি দেয়নি। তারা কক্সবাজার জেলার বাইরে শহর ও গ্রামে দুটি শরণার্থী শিবিরে বসবাস করতো। আগস্ট মাসের ২৫ তারিখের পরে যখন রোহিঙ্গারা নতুন করে গণভাবে অনুপ্রবেশ করা শুরু করলো, সরকার তখনও প্রাথমিকভাবে ইউ.এন.এইচ.সি.আর'কে অবাধে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। ইউএনএইচসিআর এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সুপারিশ ও নীতিমালা অনুযায়ী, কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের পূর্ণ জনসংখ্যার সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার ইউ.এন.এইচ.সি.আর'কে অনুমতি দেয়ার জন্য সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সম্মত হয়েছে। সরকার কক্সবাজারে নিবন্ধিত ও অনথিভুক্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি, ২৫ আগস্টের পর নতুনভাবে আগমন করা উভয়জনগোষ্ঠির সেবা প্রদান করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আই.ও.এম.) এবং অন্যান্য জাতিসংঘের সংস্থাগুলিকে অনুমতি প্রদান করেছে।

<u>অভিবাসী, শরণার্থী, এবং দেশহীন ব্যক্তিদের অবমাননাঃ</u> রোহিঙ্গাদের আগস্টের অনুপ্রবেশের আগে, ইউ.এন.এইচ.সি.আর- জানিয়েছে যে ৬৬ জন বেঁচে যাওয়া লোক ক্যাম্পে তাদের সাথে যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার কথা উল্লেখ করেছে, যাদেরকে মার্চ মাস পর্যন্ত কাউন্সিলিং বা পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

<u>দেশের অভ্যন্তরে চলাচলঃ</u> সরকার শরণার্থীদের স্ট্যাটাস বা, অবস্থা সংক্রান্ত কনভেনশন এবং প্রোটোকল বা, বিধি সম্পর্কিত বিষয়ে কোন দল নয়। সরকার কক্সবাজারের বেশিরভাগ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির চলাচল শুধুমাত্র, সেখানে কর্মরত কর্মকর্তা, এবং অস্থায়ী ক্যাম্প এলাকায় মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। বার্মার সঙ্গে সীমান্ত এলাকা থেকে, এবং প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্প এলাকা পর্যন্ত সড়কে রেফিউজিদের চলাচল বন্ধ করার জন্য, প্রধান পথগুলিতে চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছিল।

বিদেশীদের ভ্রমণঃ কিছু সিনিয়র বিরোধী কর্মকর্তা, তাদের পাসপোর্ট নবায়নে ব্যাপক বিলম্বের কথা জানিয়েছেন; অন্যরা দেশ ছাড়ার সময় তাদেরকে বিমানবন্দরে হয়রানি, ও বিলম্ব করানোর কথা বলেছেন। গত মার্চ মাসে বি.এন.পি'র একজন সিনিয়র কর্মকর্তা, তাকে বিদেশ যাওয়ার সময় বাঁধা না দেয়ার জন্য আদালতের আদেশ থাকা সত্ত্বেও, তাকে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করার সময়, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চার ঘণ্টার জন্য আটক করে রাখার, এবং হয়রানি করার অভিযোগ করেছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে, গত জুলাই মাসে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সময়ও তিনি অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলে ন।

মানবাধিকার সংক্রান্ত এন.জি.ও. অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আদিলুর রহমান খানকে, গত ২০ জুলাই কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে ১৪ ঘন্টার জন্য আটক করে রাখা হয়েছিল যখন তিনি "মালয়েশিয়ায় মৃত্যু দন্ড বিলোপ করা" বিষয়ের উপর একটি সম্মেলনের জন্য ভ্রমণ করছিলেন। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ সরকার খানকে আটক করা এবং মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি সাজিয়ে তৈরি করেছিল।

সরকার, ১৯৭১'এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সন্দেহভাজন যুদ্ধ অপরাধীদেরকে দেশ ছাড়ার পথে বাধা দিয়েছিল।

বাংলাদেশের নীতি অনুযায়ী, ইসরাইলে ভ্রমণের জন্য দেশটির পাসপোর্ট বৈধতা দেয়না।

অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ (আই.ডি.পি'স)

সরকারের নীতির কারণে অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত চলছিল, যেটা ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৭ চলেছিল, চট্রগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা এবং প্রান্তিকীকরণের জন্যই এটা শুরু হয়েছিল। এই নীতিমালার মাধ্যমে ভূমিহীন বাঙালিরা সমতল ভুমি থেকে চট্রগ্রামে স্থানান্তরিত হয়, যাতে

সি.এইচ.টি’তে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনকে বাঙালিদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করতে পারে, এবং এতে করে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষকে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আই.ডি.পি'দের সীমিত শারীরিক নিরাপত্তা ছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারা বলছেন যে কখনও কখনও নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা সমর্থিত হয়ে, বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা তাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাসিন্দাদের অধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

আগস্ট ২০১৬ সালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন .করেছে, যাতে কমিশনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের একতরফা কর্তৃত্তকে খর্ব করা হয়। সংশোধিত আইন সেই বছরকালের মধ্যে বিরোধ সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ উপজাতীয় নেতা্রা চেয়েছিলেন সিদ্ধান্তের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানির আগে আইনটির জন্য একটি শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়া হোক। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ারুল হকের মেয়াদ গত ৬ সেপ্টেম্বর শেষ হয়, কিন্তু সরকার এই বছরের শেষে কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আই.ডি.পি'দের সংখ্যা বিতর্কিত রয়ে যায়। ২০০০ সালে একটি সরকারি টাস্ক ফোর্স এটার একটা আনুমানিক ৫০০,০০০’এর হিসাব দেয়, যার মধ্যে আদিবাসী নয়, এবং আদিবাসী উভয়ই রয়েছে। সি.এইচ.টি. কমিশন আনুমানিক হিসাব দিয়ে বলেছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯০,০০০'র কিছু বেশি আদিবাসী আই.ডি.পি. হিসেবে বসবাস করে। প্রধাণমন্ত্রী আই.ডি.পি’দেরকে ফিরিয়ে আনার সুবিধার্থে সি.এইচ.টি’তে নিস্পত্তি না হওয়া ভূমি সংক্রান্ত বিরোধগুলি মিটিয়ে ফেলে, বাকী থাকা সেনা ক্যাম্পগুলি বন্ধ করার অঙ্গিকারবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বসতি স্থাপনকারীদেরকে আই.ডি.পি. হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার ব্যাপারে বিরোধ থাকার কারণে আই.ডি.পি’র উপর টাস্কফোর্সটি তাদের কাজ করাতে অসমর্থ রয়ে যায়। কমিশন জানিয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ সীমান্তে পাহারা ক্যাম্প স্থাপন করার জন্য,

এবং সেনাবাহিনী বিনোদনমূলক সুযোগসুবিধা তৈরি করার জন্য বেশ কিছু আদিবাসী পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই বছর কোন জমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি।

উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা

সেপ্টেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত সরকার ও ইউ.এন.এইচ.সি.আর. কর্তৃক প্রায় ৩৩০০০ বার্মা থেকে আগত নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা দুইটি সরকারি ক্যাম্পে (কুটুপালং এবং নয়াপাড়া) বাস করছিল তাদেরকে অস্থায়ী সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান করছিল, ঐ সময়ে, সরকার ও আই.ও.এম. প্রায় ২০০,০০০ অ-নথিভুক্ত কক্সবাজারে অস্থায়ীভাবে বসতি করা রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে সহয়তা প্রদান করে। ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী সরকার, এবং ইউএনএইচসিআর অনুমান করে যে, প্রায় ৯০০,০০০ থেকে ১০ লাখ অ-নথিভুক্ত রোহিঙ্গা এইদেশে অবস্থান করছিল, এতে ৬৫৫,০০০'রও বেশি রোহিঙ্গা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা ২৫ আগস্ট রাখাইন রাজ্যের বার্মায় সংঘটিত সহিংসতার কারণে দেশটিতে প্রবেশ করেছিল এবং আশ্রয় চেয়েছিল। বেশিরভাগ অ-নথিভুক্ত রোহিঙ্গা কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়া উপ-জিলায় স্থানীয়দের মধ্যে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে, তারা সরকারী নয়, এরকম এলাকায় বসবাস করত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে, সরকার ছয়টি মূল বিষয় সহ রোহিঙ্গাদের উপর জাতীয় কৌশল বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে: সীমান্ত ব্যবস্থাপনা করা, নিরাপত্তা বজায় রাখা, মানবিক সহায়তা দেয়া, মিয়ানমারের সাথে সহযোগিতা জোরদার করা, রোহিঙ্গা সমস্যার অভ্যন্তরীণ সমন্বয় করা এবং অ-নথিভুক্ত রোহিঙ্গাদের একটি জরিপ করা।

জাতিসংঘের মতে, আগস্ট ২৫ থেকে নতুন আগমনকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি নারী, এবং এতে প্রায় ১৬,০০০ গর্ভবতী মহিলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নূতন অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা অভিবাসীরা জঙ্গলে, পাহাড়ী গ্রামগুলিতে এবং উখিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল, এবং বেশিরভাগই বাঁশের খুঁটি ও প্লাস্টিকের শীট দিয়ে ঘড়বাড়ী তৈরি করেছিল। নতুন

অনুপ্রবেশকারীদের স্থান করে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটা মেগাক্যাম্প ডিজাইন করার জন্য সরকার ৩০০০ একর জমি সংরক্ষণ করেছিল।

সরকার থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে, এবং বেসামরিক প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কক্সবাজার জেলায় সামারিক বাহিনী মোতায়েন করেছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রোহিঙ্গাদের এবং তাদের ক্যাম্পে সুরক্ষা প্রদানের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেয়। একজন সিনিয়র সরকারি মন্ত্রী বলেছিলেন যে, নতুন অভিবাসীদেরকে শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হবে না, তিনি তাদেরকে "বল পূর্বক মিয়ানমারের বিচ্ছিন্ন করা নাগরিক" হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

<u>আশ্রয় পাওয়ার উপায়ঃ</u> দেশের আইন, আশ্রয় প্রার্থী বা শরণার্থীদের জন্য কোনো সুবিধা প্রদান করেনা, এবং শরণার্থীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সরকার কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেনি। সরকার বার্মা থেকে আগত রোহিঙ্গা বাসিন্দাদেরকে কিছু সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান করেছে। সরকার দুইটি সরকারী শরণার্থী শিবিরে নিবন্ধিত শরণার্থীদের বসবাসের জন্য অস্থায়ী সুরক্ষা এবং মৌলিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর সহযোগিতায় সাহায্য করে। সরকার ২৫ আগস্টের পর আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে নতুন বায়োমেট্রিকভাবে, বা আঙ্গুলের ছাপ সহ নিবন্ধন করতে শুরু করে এবং তাদেরকে বার্মার ঠিকানা দিয়ে পরিচয়পত্র প্রদান করে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৮৪৪,০০০ এর'ও বেশি রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিকভাবে নিবন্ধিত করা হয়েছে, এতে ২৫ আগস্টের পর থেকে আসা ৬৫৫,০০০'রও বেশি নতুন করে আসা শরনার্থী, এবং রোহিঙ্গা যারা আগে থেকেই এসেছে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

<u>চলাচল করার স্বাধীনতাঃ</u> রোহিঙ্গাদের চলাচলের স্বাধীনতার ওপর সীমাবদ্ধতা ছিল। বাংলাদেশ এবং ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর মধ্যে ১৯৯৩ সালের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নিবন্ধিত শরণার্থীদের দু'টি ক্যাম্পের বাইরে চলাচল করার অনুমতি নেই।

আগস্ট ২৫'এর পর সরকার কর্তৃক মনোনীত এলাকার বাইরে রোহিঙ্গাদের ভ্রমণ সীমিত করার জন্য পুলিশ রাস্তায় চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছিল।

<u>কার্যে নিয়োগঃ</u> সরকার দেশে বসবাস করা রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে স্থানীয়ভাবে কাজ করার জন্য অনুমতি দেয়নি। তাদের চলাচলে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কিছু শরণার্থী বেআইনিভাবে কায়িক শ্রমিক বা রিক্সা চালক হিসাবে কাজ করেছে। অননুমোদিত রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে কাজ করে, বেশিরভাগই দিনমজুর হিসাবে কাজ করেছে।

<u>মৌলিক সেবাগুলি প্রাপ্তির সুযোগঃ</u> সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পয়পরিস্কার বা স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং আশ্রয়ের বাসস্থানগুলির অবস্থা ন্যূনতম আন্তর্জাতিক মানের নীচের পর্যায়ে চলে যাওয়ার পর ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর সাথে কাজ ক'রে সরকার সরকারী উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বিভিন্ন দিকগুলির উন্নয়ন চালিয়ে যায়। কিছু মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল, এবং ক্যাম্পগুলি দেশের শহুরে বস্তির সাথে সমানভাবে ঘনত্বের সাথে জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল; ২৫ আগস্টের পরে এটি আরও খারাপ হয়ে যায়। ইউ.এন.এইচ.সি.আর. এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি থেকে ২০১৪ সালের একটি পুষ্টি জরিপের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে অপুষ্টি (শারীরিক বৃদ্ধি না হওয়া) বয়সের তুলনায় কম ওজনের কমবয়সী শিশুর সংখ্যা দেশের বাকী অংশের চাইতে বেশী, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত জরুরী সীমা'র মাত্রার চেয়েও উচ্চতর।

গণশিক্ষা, ২০১৫ সালের হিসাবে সারা দেশে যখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক, শরনার্থী ক্যাম্পের জন্য সেটা সপ্তম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা আগের বছর ছিল পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। সরকার ইউ.এন.এইচ.সি.আর'কে সরকারি ক্যাম্পে একটি অনিয়মিত, মৌলিক শিক্ষার কর্মসূচি ডিজাইন এবং পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণকারী তরুণের সংখ্যা আনুমানিক ৮,০০০-তে (৩-১৪ বছর বয়স) পৌঁছেছিল। সরকারী উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাইরে রোহিঙ্গাদেরকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকার আন্তর্জাতিক

এন.জি.ও'গুলিকে অনুমতি দিয়েছিল, যা ১০,০০০ শিক্ষার্থীর দল দিয়ে শুরু করা হয়েছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদেরকে প্রথাগত এবং জন-স্বাস্থ্যের নিয়মিত সেবাগুলো নেয়ার অনুমতি দেয়নি। পরিবর্তে, ইউ.এন.এইচ.সি.আর. এবং এন.জি.ও'গুলি নিবন্ধিত শরণার্থীদের সরকারী ক্যাম্পে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে, এবং আই.ও.এম. অস্থায়ী সাইটগুলিতে বা অবস্থানগুলোতে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদেরকে এবং স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

আগস্ট ২৫'এর পূর্বে রোহিঙ্গাদের আগমনের পূর্বে ছয়টি আন্তর্জাতিক এনজিও অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদেরকে এবং আশেপাশের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক সেবা প্রদান করেছিল। সংকটে সাড়া দেয়ার জন্য, সরকার কক্সবাজারে অতিরিক্ত কিছু এন.জি.ও'কে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল। কিছু কিছু সংস্থা রোহিঙ্গাদের সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রাপ্তিতে বিলম্বের কথা জানিয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচয়হীন ব্যক্তি

দেশে রোহিঙ্গারা বৈধ কিংবা বস্তুত রাষ্ট্র পরিচয়হীন ব্যক্তি ছিল। তারা বার্মাতে তাদের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেনি, বার্মাও তাদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না।

অধ্যায় ৩. রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে অংশ নেয়ার স্বাধীনতা

সার্বজনীন, ও সমান ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করে, সংবিধান নাগরিকদের গোপন ব্যালটের দ্বারা মুক্তভাবে, এবং সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সরকার নির্বাচন করার ক্ষমতা প্রদান করে।

নির্বাচন, এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণ

<u>সাম্প্রতিক নির্বাচণগুলিঃ</u> প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, একটি নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য ক্ষমতাসীন দলের অস্বীকৃতির প্রতিবাদে ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচন বর্জন করেছিল। এতে অর্ধেকেরও বেশী আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রয়ে যায়, এবং অনেকগুলি আসনে নামমাত্র প্রপ্তিদ্বন্দ্বিতা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় ৩০০ টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ২৩৫ টি আসন নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখে। নির্বাচন বর্জন করার কারণে, বিএনপি সংসদে কোন আসন রাখতে পারেনি। সরকারী বিরোধী দল জাতীয় পার্টি, যাদের ৩৬ টি নির্বাচিত আসন ছিল, তারা ক্ষমতাসীন জোটের'ই অংশ ছিল। সরকার সমর্থিত দলগুলি অবশিষ্ট আসনগুলির অধিকাংশ'ই ধরে রেখেছিল। শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় তার জোটের অন্য দলগুলোর প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা এই নির্বাচনকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন।

<u>রাজনৈতিক দলসমূহ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণঃ</u> নির্বাচনের জয়ী রাজনৈতিক দলগুলি উল্লেখযোগ্য সুফল ভোগ করে যার মধ্যে রয়েছে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসংস্থান এবং সরকারী ঠিকাদারী। সরকার বিরোধী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগ দিয়ে দমন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সব সম্পদকে কাজে লাগিয়েছিল, বিএনপি নেতা খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও দুর্নীতির অভিযোগও এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে পুলিশের উপর হামলা, বাস পোড়ানো ও বোমা ছুঁড়ে মারার অভিযোগে ৮৬ টি ফৌজদারী মামলার আসামি করা হয়েছিল। অন্যান্য বিরোধীদলীয় কর্মীরাও অপরাধমূলক অভিযোগগুলির সম্মুখীন হয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী নেতারা খোলাখুলিভাবে কাজ করতে পারেননি কারণ, তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা নির্যাতিত হন, এবং তাদেরকে আওয়ামী লীগ দ্বারা সন্ত্রাসবাদের জন্য দোষারোপ করা হয়। সরকার ও আওয়ামী লীগের সমালোচনাকারী সংবাদ মাধ্যমগুলি সরকার দ্বারা ভয় এবং রোজগার কমিয়ে দেয়ার ভয়ের আওতায় ছিল এবং তারা সরকার থেকে বৈরী প্রতিক্রিয়া এড়াতে স্ব-সেন্সরশিপের চর্চা করত। আওয়ামী লীগের-সংশ্লিষ্ট

সংগঠনগুলি কোনো বিচারের মুখোমুখি না হয়ে অব্যহতি পেয়ে যাবে জেনে (যেমন ছাত্র সংগঠন) গোটা দেশ জুড়ে ভয়-ভীতি দেখানো এবং সহিংসতা চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে, বিরোধী দলগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও তাদের আক্রমণের আওতাভুক্ত ছিল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার জনসাধারণের কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বিরোধীদলীয় প্রতিনিধিদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচির সম্প্রচার সীমিত করে দিয়েছিল। ২০১২ সালের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের সিদ্ধান্তটি বছরের শেষ সময় পর্যন্ত মুলতুবি ছিল।

নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণঃ কোন আইন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের এবং/অথবা সংখ্যালঘু সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত করেনি, এবং তারা অংশগ্রহণ করেছিল।

অধ্যায় ৪. সরকারের দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাব

আইন সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির জন্য অপরাধমূলক জরিমানা প্রদান করে , কিন্তু সরকার আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করেনি এবং সরকারী কর্মকর্তারা দন্ড থেকে বেঁচে যাবে জেনে দুর্নীতির কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল।

দুর্নীতিঃ দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তথ্য অনুযায়ী বছরের প্রথম আট মাসে মোট ২,৭০৪ টি মামলার ১৬৪ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে (সম্পন্ন করা হয়েছে)। এর মধ্যে ১১০ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ৫৪ জনকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছে; সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতাদের ৩৬০ টি মামলা হাইকোর্টে স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং সেগুলোর আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।

২৬ জুলাই দুদক দুর্নীতির অভিযোগ পাবার জন্য একটি হটলাইন চালু করেছে। কল সেন্টারটি প্রথম সাত দিনে ৭৫,০০০ কল এবং ২ মাসে প্রায় ২ লাখ কল পেয়েছিল। অধিকাংশ দুর্নীতির অভিযোগে সরকারি জমি অফিস, হাসপাতাল, রেলপথ ও সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় এবং ইউটিলিটি সার্ভিসগুলি জড়িত ছিল।

২০০৭ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে ৩০ কোটি টাকার (৩৮৩,০০০ মার্কিন ডলার) অবৈধ সম্পদ অর্জনে দুদকের মামলাটি চালিয়ে গিয়েছিল। ২০১৬ সালের সুপ্রিম কোর্টের আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শণ করে ৭ ফেব্রুয়ারী চট্রগ্রামের কোর্টে আত্নসমর্পন করলে কোর্ট হোসেনকে জামিন অনুমোদন করে। ২০১২ সালে হাই কোর্ট হোসেনের বিরুদ্ধে মামলাটি স্থগিত করলে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশকে বাতিল করে এবং এ.সি.সি'কে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে, এতে সরকারকে সমালোচনা করার জন্য কিছু ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রের মালিকদেরকে, এবং নাগরিক সমাজের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুদক দ্বারা অনুসন্ধান শুরু করেছে কিংবা অনুসন্ধান করবে বলে হুমকি দিয়েছে। গত ১৭'ই আগস্ট, সুপ্রিম কোর্ট রাজনীতির সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ চালানোর বিষয়ে একটি "পিক অ্যান্ড চুজ" অর্থাৎ বেছে বেছে মামলা করার নীতি বজায় রাখার জন্য দুদক'কে তিরস্কার করেছিল।

সরকার তার সম্প্রদায়্গত পুলিশী ব্যবস্থা বা কমিউনিটি পুলিশ কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান বিস্তার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক পুলিশ দুর্নীতি মোকাবেলার পদক্ষেপ নিয়েছিল।

<u>আর্থিক বিবরণ উন্মুক্ত করাঃ</u> আইন অনুযায়ী সংসদের প্রার্থী হতে হলে নির্বাচন কমিশনের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবৃতি জমা দেওয়ার প্রয়োজন। আইন

অনুযায়ী কর্মকর্তাদেরকে তাদের আয় এবং সম্পদ প্রকাশ করার প্রয়োজন পরে না। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের তদন্তের জন্য দুদকের দায়িত্ব রয়েছে কিন্তু কিছু রাজনীতিবিদের অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত বন্ধ করে দেয়া হয় কারণ সংসদীয় প্রার্থীগণ তাদের সম্পত্তির হলফনামায় ভুল করেছেন বলে জানিয়েছিলেন এবং দু.দ.ক. তাদের জ্ঞাত সুত্র থেকে ঐ সম্পদ আহরণ করার উপায় সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি।

অধ্যায় ৫. মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগকারী আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী তদন্তেগুলির বিষয়ে সরকারের মনোভাব

বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, মানবাধিকারের মামলাগুলো নিয়ে তদন্ত করার ব্যাপারে এবং তাদের উদ্ঘাটিত তথ্য প্রকাশ করার ব্যাপারে সাধারনত কিছু সরকারী সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করেছিল। সরকারি কর্মকর্তারা খুব কমই তাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি অনুকুল কোন সাড়াই দেননি।

যদিও মানবাধিকার সংস্থাগুলি প্রায়ই সরকারের তীব্র সমালোচনা করে, তবে তারা নিজেরাও কিছু স্ব-সেন্সরশিপের বা কাটছাট করার চর্চা করেছিল। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে চরমপন্থীদের কাছ থেকে হুমকি এবং ক্রমবর্ধমান প্রত্যক্ষ নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলের অবক্ষয়ের করণে একটা "ভীতির সংস্কৃতি" সভ্য সমাজের শক্তিকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। এমনকি সরকারি দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের সদস্যরা সরকারি নীতিমালার সমালোচনার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে গ্রেফতারের হুমকি পেয়েছে।

সরকার, মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' এর তহবিল এবং কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ করা অব্যাহত রেখেছে। যদিও গত ২০১৬ সালের জুন মাসে দুদক অধিকারের বিরুদ্ধে মামলাটা তুলে নিয়েছে, তবে 'অধিকারের' কর্মকর্তারা তাদের পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়া সহ সরকারি কর্মকর্তাদের এবং নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা

হয়রানির প্রতিবেদন দিয়ে আসছিল। 'অধিকারের' পারিবারের সদস্যরা ও কর্মকর্তারা অতিরিক্ত হয়রানির প্রতিবেদন দিয়েছিল এবং দাবি করেছিল যে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাদের টেলিফোন কল, ইমেইল এবং চলাফেরা অব্যাহতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল।

সরকার সব ধর্মীয় সংগঠন এবং সব এনজিও'দেরকে সামাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবন্ধন করার প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেছিল। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও'গুলি যারা সংবেদনশীল বিষয় বা দলের সাথে, যেমন ধর্মীয় বিষয়, মানবাধিকার, আদিবাসী, এল.জি.বি.টি.আই. সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা শরণার্থী, অথবা শ্রমিক অধিকার সম্পর্কে কাজ করেছিল, তারা উভয়, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সরকারি নিষেধাজ্ঞারগুলির মুখোমুখি হয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি দল দাবী করেছিল যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছিল। সরকার কখনও কখনও প্রকল্প নিবন্ধীকরণ, অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করুন এবং পুনরায় শুরু করবেন না এরকম চিঠি দিয়ে এবং ভিসা প্রত্যাখ্যান করে বিলম্বের মাধ্যমে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক এনজিওদের ক্ষমতা সীমিত করেছিল। নাগরিক সমাজের কিছু কিছু সদস্য জানিয়েছেন যে, তাদেরকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উপর্যুপরি নিরীক্ষা বা অডিট করেছিল যাদেরকে অতীতে প্রায় কখনই নিরীক্ষা করা হয়নি এবং এটা অধিকাংশ সাধারণ নাগরিকদেরকে করা হয় না।

বিদেশী অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড) রেগুলেশন অ্যাক্ট এনজিও'গুলির বিদেশী অর্থায়নকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এতে এন.জি.ও'গুলির জন্য শাস্তিমূলক বিধানও অন্তর্ভুক্ত আছে, যা দেশের সংবিধান, এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, বা সাংবিধানিক অঙ্গ-প্রতঙ্গসমুহ (যেমন, সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং নেতাদের) সম্পর্কে "অমূলক" মন্তব্য করলে সেটা প্রযোজ্য হবে।

জাতিসংঘ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহঃ কর্তৃপক্ষ দ্বারা গুম করে দেয়ার, বা বলপূর্বক অন্তর্ধানের ব্যাপারে জাতিসংঘের কর্ম পরিষদের একটি দলের বাংলাদেশ সফর করার অনুরোধটিতে সরকার কোনো সাড়া দেয়নি।

মানবাধিকারের সরকারি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে (এন.এইচ.আর.সি.) সাতজন সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে পাঁচজন'ই সম্মানিত বা অনারারী পদে রয়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, এন.এইচ.আর.সি'র প্রতি সরকারের ক্ষুদ্র সমর্থন, অপর্যাপ্ত কর্মী ও অপ্রতুল অর্থের বরাদ্দ'ই কমিশনের কার্যকারিতা ও স্বাধীনতা সীমিত করে দিয়েছিল। এন.এইচ.আর.সি'র প্রাথমিক কর্মকাণ্ড ছিল জনসাধারণকে মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া এবং মানবাধিকার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।

অধ্যায় ৬. বৈষম্য, সামাজিক নির্যাতন, এবং পাচার

নারী

ধর্ষণ এবং গৃহাভ্যন্তরের সহিংসতা: আইন পুরুষ কর্তৃক কোনো নারীকে ধর্ষণ করা, এবং স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু নারীর বয়স যদি ১৩ বছরের বেশী হয় সেক্ষেত্রে বিবাহোত্তর ধর্ষণকে আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, বা যাবৎ জীবন কারাদন্ড হতে পারে।

যৌন সহিংসতার শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। গত এপ্রিলের ২ তারিখে ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানার মহিলা পুলিশ কনস্টেবল হালিমা বেগম একই থানার উপ-পরিদর্শক (এস.আই.) মিজানুল ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করার পর আত্মহত্যা করেছেন। হালিমার ডায়েরী, যার মধ্যে এস.আই. ইসলামের দ্বারা তাকে ধর্ষণ সম্পর্কে একটি লেখা অন্তর্ভুক্ত ছিল, এছাড়াও উল্লেখ ছিল যে, সে এস.আই. ইসলামের বিরুদ্ধে তার ধর্ষণ সম্পর্কিত গৌরীপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের (ওসি)কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছিল কিন্তু

ও.সি সেটা গ্রহণ করেন নি। হালিমার আত্নহত্যার পর পুলিশ এস.আই ইসলামকে গ্রেফতার করেছিল।

মানবাধিকার বিষয়ক মনিটর বা পর্যবেক্ষকদের মতামত অনুযায়ী অনেকগুলি আইনি পরিষেবা নেয়ার সক্ষমতা না থাকায়, সামাজিক কলঙ্কের ভয় অথবা আরো হয়রানির আশংকা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আইনি প্রয়োজনীয়তাগুলির কারণে বেশিরভাগ ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীরা তাদের ধর্ষিত হওয়ার কথা জানায় না।

অন্যান্য ক্ষতিকর ঐতিহ্যবাহী চর্চাসমূহ: কিছু এন.জি.ও. যৌতূক নিয়ে বিরোধ সম্পর্কিত নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিবেদন দেয়। বছর জুড়ে এ .এস.কে. যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতার শিকার ২২১ জন নারীকে নথিভুক্ত করেছিল।

একটি সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের রায়ে "ফতোয়া" (ধর্মীয় আদেশগুলি) শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়গুলি নিস্পত্তি করার জন্য অনুমতি দেয়; আদালতের দেয়া কোনো শাস্তির ন্যায্যতা যাচাই করার জন্য ফতোয়া ব্যবহার করা যাবে না, এবং ধর্মনিরপেক্ষ কোনো আইনকেও সেগুলো অগ্রাহ্য করবে না, বা সরিয়ে দিতে পারবে না।

ইসলামী ঐতিহ্যই নির্দেশনা দেয় যে কেবলমাত্র ইসলামী আইনের উপর অভিজ্ঞ ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তিরাই ফতোয়া ঘোষণা করতে পারেন। এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গ্রামের ধর্মীয় নেতারা মাঝে মাঝে এই ধরনের ফতোয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই ঘোষণা বিচার বহিরর্ভূত শাস্তির কারণ হয়ে দাড়ায় এবং প্রায়ই সেটা নৈতিক অন্যায় বা পাপ করেছে ধারণা করে নারীদেরকে এই শাস্তিগুলি দেয়া হয়।

নারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের দ্বারা সংগঠিত বিচার বহির্ভূত শাস্তির ঘটনাগুলি ঘটে, কখনও কখনও ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে ফতোয়া প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে। এই ঘটনায় বেত্রাঘাত, পিটুনি ও অন্যান্য শারীরিক সহিংসতার ধরনগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আক্রমণকারী ভুক্তভুগীদের মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে - সাধারণত এতে মেয়েদের চেহারা বিকৃত হয়ে যায় এবং প্রায়ই অন্ধ হয়ে যায়। এসিড আক্রমণগুলি প্রায়ই মেয়েটি দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয়াতে কিংবা জমি বিরোধের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

আইনটি এসিডের প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণে এবং এসিড-সম্পর্কিত সহিংসতায় নারীর প্রতি সহিংসতা কমানোর চেষ্টা করে, তবে আইনের সচেতনতার অভাব এবং আইনটির দুর্বল প্রয়োগ এর প্রভাব সীমিত করে দেয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শুধু সম্পর্কযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ক্রেতাদের কাছেই অ্যাসিড বিক্রয়ের বিধি করে দিয়ে, অ্যাসিড ক্রয়-বিক্রয় সীমিত করে দেয়।

যৌন হয়রানিঃ যদিও ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যৌন হয়রানি সম্পুর্ন নিষিদ্ধ করা হয়, ২০১৬ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ জাতীয় নারী আইনজীবী সমিতির (বি.এন.ডব্লিউ.এল.এ.) একটি নথিতে উল্লেখ করা হয় যে, যৌন হয়রানি একটি সমস্যা হিসাবে রয়েই গেছে এবং নির্দেশনাটির পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের নীতি নিঃসন্দেহে দুর্বল ছিল আর যে কারণে কখনো কখনো মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বা কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়া বাঁধা হয়ে দাড়ায়।

বলপূর্বক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণঃ জোরপূর্বক গর্ভপাত, অনিচ্ছাকৃত নির্বীর্যকরণ, বা অন্যান্য বাধ্যতামূলক জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কোন প্রতিবেদন নেই। মাতৃমৃত্যুর হার এবং গর্ভনিরোধক সাফল্যের হারের অনুমানটি , এই ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়: www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/.

বৈষম্যঃ সংবিধান এই মর্মে ঘোষনা দেয় যে আইনের চোখে সব নাগরিক সমান, এবং সবারই আইনের সুরক্ষা সমভাবে পাওয়ার অধিকার আছে। এটা স্পষ্টতই নারীর সমান অধিকার "রাষ্ট্র ও জনগণের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে" সর্বতভাবে স্বীকৃতি দেয়। তা সত্ত্বেও নারীরা আইন অনুযায়ী পরিবারের মধ্যে পুরুষের মত একই স্থানে

অবস্থান করেনা, পারিবারিক সম্পত্তি, এবং উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রেও সমান অধিকার ভোগ করে না। ঐতিহ্যগত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের অধীনে, পুত্ররা সম্পত্তির যা পাবে, কন্যারা তার অর্ধেক মাত্র উত্তরাধিকারী। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অধীনে, বিধবা স্ত্রী তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার তার জীবনকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, এবং তার মৃত্যুর পরে পুরুষ উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরে যাবে।

সন্তানরা

জন্ম নিবন্ধনঃ কোন ব্যক্তিকে জন্ম সুত্রে বাংলাদেশি বলা যাবে যদি তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক হয়, যদি পিতা-মাতার জাতীয়তা জানা না থাকে এবং শিশুটির জন্ম যদি বাংলাদেশের এলাকার ভিতরে হয়ে থাকে, কিংবা যদি তার পিতা বা পিতামহের জন্ম বাংলাদেশের ভূখন্ডের ভিতরে হয়ে থাকে। যদি একজন ব্যক্তি পূর্বপুরুষের মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে তবে তার পিতা বা পিতামহকে অবশ্যই ১৯৭১ সালে বা পরে এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। একটি জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট পেতে হলে জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন হয়। আরও তথ্যের জন্য, নিম্নের ওয়েব সাইট'টি দেখুনঃ http://www.data.unicef.org

শিক্ষাঃ শিক্ষা আইনগতভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক , এবং সরকার মেয়েদেরকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে রাখার জন্য পিতামাতাদের কাছে ভর্তুকি দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। শ্রেণী শিক্ষা বিনা মূল্যে হলেও শিক্ষকের বেতন, বই-পুস্তকের মূল্য, পোষাকের মূল্য অনেক ব্যায়বহুল ছিল যা তাদের সন্তানদেররকে স্কুলে পাঠানোর জন্য বাধা হয়ে দাড়ায় এবং সরকার শিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য শত শত কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছিল।

প্রাথমিক স্কুলে তালিকাভুক্তি লিঙ্গ সমতা দেখিয়েছে তবে মাধ্যমিক স্কুল শেষ করার হার কমেছে, দেখা গেছে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি এই স্তরটি শেষ

করেছে। কম বয়সে ও জোরপূর্বক বিবাহের কারণেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মেয়েদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়ার একটি কারণ ছিল।

শিশু নির্যাতনঃ অনেক ধরনের শিশু নির্যাতন দেখা যায়, এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, অপমানজনক শাস্তি, শিশু পরিত্যাগ, অপহরণ এবং পাচার, গুরুতর ও ব্যাপক এই সমস্যাগুলি চলমান ছিল। সব পরিবেশেই শিশুদের নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকি ছিলঃ বাড়ি, প্রতিবেশী এলাকা, স্কুল, আবাসিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থল। ২০১৬ সালে অক্টোবর মাসে ইউনিসেফের সমর্থনে সরকার "শিশুদের হেল্প লাইন -১০৯৮" নামে একটি বিনামূল্যে টেলিফোন সেবা ব্যবস্থা চালু করেছে যা সহিংসতা, অপব্যবহার ও শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সাহায্য করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল।

অগ্রগতি সত্ত্বেও এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং এজেন্সি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও শিশু পাচার, অপর্যাপ্ত যত্ন এবং পাচারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া শিশুদের সুরক্ষা করার সমস্যাটি অব্যাহত থাকে। কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম এবং নির্দিষ্ট কিছু শিল্পে অপব্যবহারের সমস্যা ছিল, বেশিরভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলিতে এবং গৃহস্থালি কাজে লিপ্ত শিশু কর্মীরা তাদের এরকম অনানুষ্ঠানিক কর্মস্থলে, সকল ধরনের অপব্যবহারের জন্য ঝুঁকির মধ্যে ছিল।

অপ্রাপ্ত বয়সে জোরপূর্বক বিবাহঃ বিয়ের বৈধ বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ এবং পুরুষের জন্য ২১। গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী সংসদ শিশু বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করে, যার মধ্যে "বিশেষ পরিস্থিতিতে" যেকোনও বয়সে নারী ও পুরুষের বিয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার এই আইন সম্পর্কিত শিশু অধিকার সংগঠন, মানবাধিকার সংস্থা, এবং উন্নয়ন সহযোগীদের উত্থাপিত সুপারিশ, এবং উদ্বেগগুলিকে উপেক্ষা করেছে। গত ১০ই এপ্রিল, বি. এন. ডব্লিউ.এল.এ. কর্তৃক দায়ের করা একটি রীট পিটিশনের জবাবে হাইকোর্টের আদেশে একটি অপ্রাপ্ত বয়সের বিয়ে করার অনুমতি প্রদানের বিধান কেন অবৈধ বলে ঘোষণা করা হবে না তা সরকারকে ব্যাখ্যা করতে বলেছে। বি. এন. ডব্লিউ.এল.এ'এর আবেদনটিতে যুক্তি দেয়া হয়েছিল যে মুসলিম

পারিবারিক আইনে বিবাহকে "একটি চুক্তি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়, সেক্ষেত্রে একটি নাবালিকা মেয়ে, চুক্তির একটি পক্ষ হতে পারে না।

অপ্রাপ্ত বয়সে ও জোরপূর্বক বিয়ে কমাতে একটি প্রচেষ্টায় সরকার বাধ্যতামূলক পঞ্চম শ্রেণীর পরে, পরবর্তী শ্রেণীগুলির জন্য মেয়েদের স্কুল ব্যয়ের জন্য বৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। সরকার ও এনজিও'গুলি পিতামাতাদের শেখানোর জন্য কর্মশালা এবং সরকারি অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেছিল।

শিশুদেরকে যৌন শোষণঃ শিশুদের উপর সুযোগ নিয়ে যৌন শোষণ চালানোর জন্য শাস্তি ১০ বছরের থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান আছে। শিশুদেরকে নিয়ে তৈরি অশ্লীল ছবি বানানো এবং এই ধরনের উপাদান বিক্রয় করা বা বিতরণ করা নিষিদ্ধ।

বিচ্ছিন্ন বা স্থানান্তরিত শিশুরাঃ অধ্যায় ২.ঘ দেখুন

আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণঃ আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণের নাগরিক বিষয়গুলির উপর হেগ'এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী পক্ষ নয় দেশটি। আন্তর্জাতিক পিতা- মাতা দ্বারা শিশু অপহরণ বিষয়ের উপর উল্লেখিত ওয়েব সাইট থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটস'র বার্ষিক রিপোর্ট দেখুণঃ
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html

ইহুদি-বিদ্বেষ

দেশে কোন ইহুদি সম্প্রদায় ছিল না কিন্তু রাজনীতিবিদ ও ইমামরা তাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে সমর্থন লাভের জন্য ইহুদি-বিদ্বেষী বক্তব্যগুলি ব্যবহার করেছে।

একটি উচ্চ পর্যায়ের মামলার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদরা ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে গোপনে অশুভ আঁতাত করার বিরোধিতা করে বিরোধী দলীয় নেতাকে দোষারোপ করে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য ইহুদি-বিদ্বেষ অনুভূতির প্রতিফলন ঘটায়। একজন উচ্চ পর্যায়ের গ্র্যান্ড ইমামও ফতোয়া জারী করার জন্য

এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে সহযোগিতার ভান্ডার দিয়ে সাহায্য করার জন্য ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখিত বিলিপত্রগুলি প্রচার করার জন্য পরিচিত ছিলেন।

মানব পাচার করা

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানব পাচারের প্রতিবেদনটি নিম্নের ওয়েব সাইটটিতে দেখুন - www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি

আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বৈষম্য নিষিদ্ধ করে সমান আচরণ এবং স্বাধীনতা প্রদান করে কিন্তু সরকার এই বিধানগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি।

যদিও আইন অবকাঠামোগুলিকে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশযোগ্য করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু সরকার আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করেনি। বিভিন্ন এনজিও'গুলি ২০১৬ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অবহেলার একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল, যেমন বিভিন্ন অবকাঠামোগুলিতে প্রবেশ করার সক্ষমতা, ন্যায়বিচারের সুযোগ, নারীর অধিকার, প্রতিবন্ধীদের অধিকার, শোষণ, সহিংসতা এবং অপব্যবহার থেকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার, একটি ভালো ও নিরাপদ কাজের জায়গা, কর্মসংস্থানের অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার অধিকার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হয়েছে কিনা এবং চাকরি পাওয়ার সুযোগের জন্য আবেদন করেছিল কি-না তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আইনটি প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে এসেছে। এই নিবন্ধনটি তাদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ক'রে ভোট দিতে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দেয়। এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা কর্পোরেশন বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ

করতে পারবেনা, যদি বৈষম্যমূলক কিছু করা হয় তাহলে জরিমানা করা যাবে কিংবা প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে স্কুল, কাজ বা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অসম আচরণের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা আছে, যদিও আইনের বাস্তবায়নটি অসম ছিল। আইনটি ২৭-সদস্যের একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল, তাদেরকে আইনটির সকল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমস্ত সরকারী সংস্থা ও প্রাইভেট সংস্থাগুলির মধ্যে প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমগুলির সমন্বয় সাধন করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল । আইনটির জন্য প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় অধিকার এবং সুরক্ষা কমিটির গঠন এবং কার্যকরীতা বিলম্বিত হওয়াতে আইনের বাস্তবায়নটিও ধীর গতির ছিল।

অক্ষমতার বিরুদ্ধে কাজ করে এরকম এন.জি.ও'গুলির কার্যক্রমের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিশুদের শতকরা ৯০ ভাগই সরকারি স্কুলগুলোতে উপস্থিত হয়নি। সরকার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী বিশষজ্ঞদেরকে নিয়োগ দিয়েছিল, প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য সরকার বৃত্তি বরাদ্দ করেছিল।
আইনটি প্রতিবন্ধীদেরকেও প্রতিবন্ধি নয় এরকম জনসাধারণের মত তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করে, তবে এই অধিকারগুলির প্রয়োগ নির্ভর করে পরিবার এবং সম্প্রদায়ের কাঠামো ও প্রভাবগুলির উপর।

আইনটি, সরকারি-খরচে আইনি পরিষেবাগুলির জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্তির নাগরিক হিসাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, সমাজ সেবা বিভাগ, এবং প্রতিবন্ধিদের উন্নয়নের জন্য জাতীয় ফাউন্ডেশনের মত সরকারি সংস্থাগুলি প্রতিবন্ধিদের অধিকার রক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সরকারি সুযোগ -সুবিধা ছিল অপর্যাপ্ত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্নায়বিক অক্ষমতার মূল্যায়ন করার জন্য সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। চিকিৎসা ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য অনেকগুলি বেসরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান আছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এন.জি.ও'গুলি সেবা প্রদান করে এসেছে

এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। সরকার৬৪ টি জেলাতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০৩ টি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে পুনর্বাসন সেবা এবং সহায়তাকারী ডিভাইস বা যন্ত্র সরবরাহ করে। সরকার অটিজম গবেষণা এবং সচেতনতার উন্নয়ন করেছে।

জাতীয় / বর্ণগত/ জাতিগত সংখ্যালঘু

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক হামলা অব্যাহত ছিল , আপাতদৃষ্টিতে সেটা আন্তর্জাতিকভাবে সহিংস চরমপন্থিদের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ১১ ই নভেম্বর, প্রচার মাধ্যমগুলির প্রতিবেদনে দেখিয়েছে যে ইসলাম সম্পর্কে অবমাননার ফেসবুক পোষ্টিং-এর গুজবের প্রতিক্রিয়ায় রংপুরে প্রায় ৩০ টি হিন্দু পরিবারের বসতবাড়ি স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা ভাংচুর করা হ য় এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এন.জি.ও'গুলি জাতিগত উৎস, বর্ণ, এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের বৈষম্যের শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু দালিতদের (সর্বনিম্ন-বর্ণের হিন্দু) জন্য জমির মালিকানা পাওয়ার, পর্যাপ্ত বাসস্থান, শিক্ষা, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত ছিল।

আদিবাসী জনগণ

পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য আলাদা সরকারি বরাদ্দ বা কোটা থাকা সত্ত্বেও সরকারি চাকুরি ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্রগ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণের ব্যাপক বৈষম্যের ও অপব্যবহারের মুখোমুখি

হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্রগ্রামের শান্তি চুক্তিতে স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই অবস্থাটি চলতে থাকে, চুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। চট্রগ্রাম পাহাড়ি এলাকা বা সি.এইচ.টি'র আদিবাসী ব্যক্তিরা তাদের ভূমিকে প্রভাবিত করে এরকম আলোচনায় ভূমি কমিশনের সাথে কাঠামোগত ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিরোধের কারণে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় সরকার ভূমি ব্যবহারের ব্যপারে ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। ভূমি কমিশনটিকে গঠন করা হয়েছিল অবৈধভাবে দখল করা জমিগুলিকে তদন্ত করে ফেরৎ দেয়ার জন্য কিন্তু ঐ বছর তারা কোনো বিরোধ মিমাংসা করেনি।

চট্রগ্রাম পাহাড়ি এলাকা ছাড়া অন্যান্য এলাকায় বসবাস করা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি বাঙ্গালি মুসলমানদের কাছে তাদের ভূমি হারিয়েছে বলে জানিয়েছে এবং আদিবাসী জনগণের পক্ষের পরামর্শদাতাদের সংঠনগুলি রোহিঙ্গা বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা ভূমি দখল করার কথা জানিয়েছে। সরকার মৌলভীবাজার ও মধুপুর বন এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী মালিকানার জমিগুলি অধিগ্রহণের জন্য নির্মাণ প্রকল্প অব্যাহত রেখেছে।

গত ২০১৬ সালের নভেম্বরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাঁওতাল গোষ্ঠীর সাথে শত্রুতামূলক অগ্নিসংযোগ ঘটনার বিচারিক তদন্তের সহযোগিতায় ব্যর্থতার জন্য গাইবান্ধার পুলিশ সুপার আশরাফুল ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য গত ৭'ই ফেব্রুয়ারি হাই কোর্ট সরকারকে আদেশ দেয়। সাঁওতালের বাড়িগুলিতে অগ্নিসংযোগ করার জন্য পুলিশের তদন্তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুইজন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে দায়ী করে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সাঁওতালদের বেশিরভাগই খ্রিস্টান আদিবাসী এবং তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০০,০০০ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন যে, চিনিকলের শ্রমিকদের সঙ্গে জমির মালিকানা নিয়ে সংঘটিত সঙ্ঘর্ষে অনেক পুলিশ সদস্য জড়িত ছিল। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গ্রামের উপর

হামলার জন্য সাঁওতাল সম্প্রদায় সদস্যরা স্থানীয় অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে দায়ী করে।

যৌনাভ্যাস, এবং যৌন অভিযোজনের উপর ভিত্তি করে সহিংসতা, বৈষম্য, এবং অন্যান্য অপব্যবহাররের আইন

আইনের অধীনে সম্মতিক্রমে সমকামী যৌন কার্যকলাপ অবৈধ। এল.জি.বি.টি.আই. বা সমকামী, উভয়লিংগ বা হিজড়া গোষ্ঠীগুলি জানিয়েছে যে এল.জি.বি.টি.আই'র ব্যক্তিদেরকে এবং মেয়েলি আচরনের ব্যক্তি যাদের যৌনাভ্যাস বা যৌন অভিযোজ যাই হোক না কেন তাদেরকে দমন করার জন্য এবং এল. জি.বি.টি.আই. বা LGBTI সংস্থাগুলির নিবন্ধন সীমাবদ্ধ করার জন্য পুলিশ আইনটি ব্যবহার করেছে। কিছু কিছু গোষ্ঠী জানিয়েছে যে একটি পুলিশী ধারার সন্দেহজনক আচরণের বিধানের অধীনে তাদেরকে হয়রানি করা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়া জনসংখ্যা বহুদিন থেকে এই সমাজে একঘরে অবস্থায় বা প্রান্তিকরণ অবস্থায় আছে কিন্তু এরা সরকারিভাবে স্বীকৃত সমাজের অংশ, এরা সবসময় ভয়ানক সহিংসতার ভীতি এবং হয়রানির মধ্যে থাকে এবং দুর্বল গোষ্ঠিগুলিকে তাদের বিরুদ্ধে চরমপন্থী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সবসময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়।

এল.জি.বি.টি.আই. (LGBTI) সম্প্রদায়ের সদস্যরা টেলিফোনে টেক্সট দ্বারা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হুমকির বার্তা পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে।

গত মে মাসে, র‍্যাব বাহিনী কেরানিগঞ্জের ছায়ানীড় কমিউনিটি সেন্টারে স্থানীয় এল.জি.বি.টি.আই. (LGBTI) সম্প্রদায় কর্তৃক আয়োজিত একটি নৈশভোজে অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অভিযানের সময় উপস্থিত ১২০ জনের মধ্যে ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সাক্ষী বলেন, র‍্যাব নৈশভোজে অংশগ্রহণকারীদেরকে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে পৃথক করে, এবং গ্রেফতারের জন্য

ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করার আগে, তাদেরকে মারধর করে। অভিযানের সময় র‍্যাব মিডিয়াতে ঘোষণা দেয় যে, সমকামিতার কার্যকলাপের সন্দেহের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং তারা গ্রেফতারকৃত কয়েকজন ব্যক্তির ছবি তোলার'ও অনুমতি দেয়। র‍্যাব পরে ঘোষণা করে যে হামলার সময় অংশগ্রহণকারীরা "অবৈধ যৌন কার্যকলাপে" নিযুক্ত ছিলনা এবং এর পরিবর্তে বলে যে তাদেরকে মাদকদ্রব্য রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় - বিশেষত "ইয়াবা" (ম্যাথামফেটামিন এবং ক্যাফিনের সংমিশ্রণ) এবং ক্যানবিস। আদালত ব্যবস্থায় চার ব্যক্তিকে পুলিশ দ্বারা আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের হেফাজতে তুলে দেয়া হয়েছিল। বাকি ২৪ জন ব্যক্তির মধ্যে ১২ জনকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছিল এবং ১২ জনকে সরাসরি কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।

এই ঘটনার পর এবং ক্রমাগত হয়রানি করার পরে এল.জি.বি.টি.আই. সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সদস্য, যারা গুরত্বপূর্ণ সহায়তাকারী সংস্থাগুলির নেতৃত্বে ছিলেন, তাদের কার্যক্রমগুলি কমিয়ে দিতে থাকেন এবং দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে আশ্রয় চান। এর ফলে এল.জি.বি.টি.আই. ব্যক্তিদের জন্য রইল শুধুমাত্র নিতান্তই দুর্বল সমর্থন দেয়ার এবং সহায়তাকারী নেটওয়ার্কগুলি। বিশেষ করে লেসবিয়ানদের বা নারী সমকামীদের সহায়তা করার সংগঠনগুলি দিন দিন দূর্লভ হতে চলেছে। যৌন ঝোঁকের উপর ভিত্তি করে গুরুতর সামাজিক কলঙ্ক খুব সাধারণ একটা ব্যাপার ছি ল এবং এই বিষয়ে খোলা মেলা আলোচনা করা বাধাগ্রস্ত করেছিল।

এইচ.আই.ভি, এবং এইডস'এর জন্য সামাজিক কলঙ্ক

এইচ.আই.ভি. এবং এইডস'র বিরুদ্ধে সামাজিক কলঙ্ক এবং উচ্চ ঝুঁকির জনসংখ্যার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়া সম্প্রদায় এবং পুরুষ হয়ে পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক গড়া ব্যক্তিদের জন্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া একটি বাধা হতে পারে।

অন্যান্য সামাজিক সহিংসতা, বা বৈষম্য সমূহ

আইন নিজের হাতে নিয়ে হত্যা করার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলি প্রতিবেদনে দেয়া ঘটনাগুলির সংখ্যা স্বীকার করে তবে এই সংখ্যাটি প্রকৃত ঘটনার শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রতিনিধিত্ব করে। অবৈধ ফতোয়া এবং গ্রাম সালিসি, যা একটি বিশিষ্ট স্থানীয় এনজিও ব্যাখ্যা দিয়েছে যে বিচারের এই রায়টি ধর্মীয় পণ্ডিতদের পরিবর্তে সম্প্রদায়ের নেতাদের দ্বারা প্রদত্ত রায়, এরকম ঘটনাও ঘটেছে। 'অধিকারের' হিসাবে, জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত আইন নিজের হাতে নিয়ে হত্যা করার ঘটনায় মোট ২১ জন সজাগ হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিল, প্রধানত, বিচারহীনভাবে জনসম্মুখে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার মাধ্যমে।

অধ্যায় ৭. শ্রমিকের অধিকার সমূহ

ক. সমিতিতে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা, এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার

আইনটি সমিতিতে বা ইউনিয়নে যোগ দেয়ার অধিকার দেয় এবং সরকারী অনুমোদনের সাপেক্ষে ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার প্রদান করে , যদিও শ্রম অধিকার সংস্থাগুলি বলেছে যে ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণের জন্য কঠোর প্রয়োজনীয়তাগুলি এখনো রয়ে গেছে। আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুযা য়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য অনুমো দন দেয়ার পূর্বে ঐ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রম শক্তির মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ শ্রম শক্তিকে ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে সম্মত হতে হবে। ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৩০ শতাংশ থেকে নীচে নেমে আসলে মন্ত্রণালয় ইউনিয়নটিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করতে পারে। আইনটি কেবল প্রাচীর-থেকে-প্রাচীর'এর মধ্যে (সমগ্র কারখানার) দরকষাকষির স্থান হিসাবে অনুমতি দেয়। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকের সংজ্ঞাতে ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদেরকে শ্রমিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে না। অগ্নিনির্বাপক কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষী এবং নিয়োগকারীদের একান্ত সহকারীরা ইউনিয়নটিতে যোগদান করতে পারবে না। সিভিল সার্ভিস বা সরকারি কর্মকর্তাদের এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মচারীদের জন্য ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ। শ্রম আদালতের অনুমোদন নি য়ে মন্ত্রণালয়টি অন্যান্য

কারণগুলির জন্য ইউনিয়নগুলিকে বাতিল করতে পারে। ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করলে বা নিবন্ধন অনুমোদন দেয়া অস্বীকার করলে ইউনিয়কে আপীল করার অধিকার দেয় আইনটি। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয় না, জাতীয় শ্রম আইন থেকে এটা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম (নীচে দেখুন)।

শ্রম আইনে উল্লিখিত কারণগুলিতে নেই এরকম কারনগুলির উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ইউনিয়নগুলির নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের প্রতিবেদন অব্যাহত ছিল। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিকের জন্য ৭,৭৫১ টি ট্রেড ইউনিয়নের কথা জানিয়েছে, ২০১৩ সাল থেকে গার্মেন্টস খাতে ৪৬৪ টি নতুন ইউনিয়নসহ পোশাক খাতে মোট ৫৯৬ টি ইউনিয়ন রয়েছে। মন্ত্রণালয়টি জানিয়েছে যে চিংড়ি খাতের ১৬ টি ইউনিয়ন এবং চামড়া ও ট্যানারী শিল্পে ১৩ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সলিডারিটি সেন্টারের মতে, তৈরি পোশাকের (আর.এম.জি.) খাতে ইউনিয়নগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যার (১২২) কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বা নিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার চর্চার কারণে এই বছর সক্রিয় থাকতে পারেনি।

২০১৫ সালে আবেদনপত্রগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পরে, ট্রেড ইউনিয়ন আবেদন হার বিশেষ করে ২০১৬ সালে কমে গিয়েছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট চাপের পর এই বছরে সেটা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রামে ইউনিয়ন নিবন্ধনের হার সাধারণত ঢাকার তুলনায় কম ছিল এবং চট্টগ্রামে ইউনিয়ন বিরোধী আচরণ অব্যাহত থাকার কারণে ইউনিয়নের জন্য আবেদনের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। সলিডারিটি সেন্টার জানিয়েছে যে ৩৯৯ টি আর.এম.জি. বা তৈরি পোশাক কারখানায় ইউনিয়ন ছিল এবং কিছু কিছু কারখানায় একাধিক ইউনিয়ন ছিল।

আইনটি, বৈধভাবে বিক্ষোভ পরিচালনা করার অধিকার প্রদান করে, কিন্তু অনেক সীমাবদ্ধতার সাথে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার "সম্প্রদায়ের জন্য গুরুতর কষ্টকর" হতে পারে এরকম ধারণা ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করতে পারে এবং ৩০ দিনের বেশি স্থায়ী

কোনও ধর্মঘট স্থগিত করতে পারে। এছাড়াও, আইনটি বাণিজ্যিকভাবে প্রথম তিন বছরের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বা বিদেশী বিনিয়োগকারীর অথবা বিদেশী মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে। ঢাকার একটি শিল্প উপকূলে আশুলিয়াতে ডিসেম্বর ২০১৬'তে সংঘটিত ব্যাপক ধর্মঘট থেকে শ্রমিক ও ইউনিয়ন কর্মীরা ক্রমাগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। হরতাল বা ধর্মঘট চলাকালে প্রায় ৬০ টি কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিল, যখন হাজার হাজার কর্মী বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে ধর্মঘটে যোগদান করেছিল তখন। দেশের প্রধান শ্রমিক ফেডারেশন ধর্মঘটটি সংগঠিত করেনি এবং তাদের সদস্যদেরকে ধর্মঘট না করার জন্য উপদেশ দিয়েছিল। আশুলিয়া, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে কমপক্ষে ২৬ জন শ্রমিক নেতাকে বিশেষ ক্ষমতা আইন সহ বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেছিল এবং ১৫০০ থেকে ৩,৫০০ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ২০১৬ সালের ২৬ শে ডিসেম্বরের পরে কারখানা পুনারায় চালু হওয়ার প র শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের থেকে অভিযোগে অব্যাহত ছিল যে বছরের বেশিরভাগ সময় পর্যন্ত পুলিশ শ্রমিকদের উপরে নির্যাতন চালিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে আতঙ্কিত করেছিল, এবং এতে সাধারণ ইউনিয়ন বিরোধী আচরণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভীতিকর কৌশলগুলির মধ্যে ছিল, ইউনিয়নের সভায় এবং অফিসে ঘনঘন পুলিশের পরিদর্শন, পুলিশ দ্বারা ইউনিয়ন মিটিংগুলির ভিডিও রেকর্ডিং গ্রহণ এবং ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থনকারী এনজিও'দের উপর পুলিশের পর্যবেক্ষণ। আশুলিয়ায় শ্রমিক অসন্তোষের বেশিরভাগ শ্রমিককেই পুনর্বহাল করা হয়েছে তবে এই মামলাগুলির সমাধান করতে আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি মুলতবি রয়ে গেছে।

আশুলিয়ার অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের উদ্বেগ মোকাবেলার জন্য সরকার স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় পরামর্শমূলক কাউন্সিল (টিসিসি) গঠন করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতি-মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ২০ সদস্যের কাউন্সিলের সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে ছয়জন প্রতিনিধি, সরকার থেকে ছয়জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদের থেকে ছয়জন প্রতিনিধি কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাউন্সিলটির বছরে কমপক্ষে তিনবার একত্রিত হওয়ার কথা কিন্তু কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য যে কোনো সময় একত্রিত হয়ে বসার জন্য আহ্বান জানাতে পারেন। শ্রমিক নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিযুক্ত করা হয়েছে, নির্বাচিত করা হয়নি এবং সেই কারনেই অনির্বাচিত ঐ কাউন্সিল সদস্যগণ কেউ কেউ আর.এম.জি. শিল্পে সক্রিয় ছিলেন না, কেউ খুব ছোট ফেডারেশনের নেতা ছিলেন অথবা এই শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন না।

টিসিসি'র প্রথম মামলাটি ছিল একটি তদন্তের যা বাংলাদেশ স্বাধীন গার্মেন্টস ইউনিয়ন ফেডারেশনের (বি.আই.জি.ইউ.এফ.) এবং একটি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আজিম গ্রুপের মধ্যে বিরোধের যারা কয়েকটি কারখানা পরিচালনা করছিল। শ্রমিক ও শ্রম নেতারা অভিযোগ করেন যে আজিম গ্রুপ এর মালিকানাধীন চট্টগ্রামের দুইটি কারখানায় (সাভার সোয়েটার লিমিটেড এবং ওর্কিড সোয়েটার লিমিটেড) তারা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করার চেষ্টা করার জন্য কারখানার মালিক এবং পুলিশ তাদেরকে আতঙ্কিত করেছিল, তারা তাদেরকে শারীরিকভাবেও হয়রানি করেছিল। বি.আই.জি.ইউ.এফ.'র ইউনিয়ন গঠন করার আবেদনটি গত আড়াই বছরে চার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। শ্রমিক ও শ্রম নেতারা অভিযোগ করেন যে গত ২৭ মে কারখানার বাইরে কর্মক্ষেত্রে ইউনিয়নের পক্ষের কর্মরত শ্রমিক ও বি.আই.জি. ইউ.এফ এর কর্মীদের উপর শারীরিকভাবে আক্রমন চালান হয়েছিল। জুন মাসে, মালিকদের পক্ষে কাজ করে এরকম একটি গোষ্ঠী, যারা নিজেদেরকে চিটাগাং ওয়ার্কার্স ইউনিটি কাউন্সিল হিসাবে পরিচয় দেয়, তারা বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল এবং বিলিপত্র বিতরণ করেছিল, যে বিলিপত্রে একজন সুপরিচিত বি.আই.জি.ইউ.এফ.'র নেতার গলার চারপাশে ফাঁসির একটি দড়ির চিত্র তুলে ধরেছিল এবং তার মৃত্যুর আহ্বান জানিয়েছিল। উপরন্তু, আজিম গ্রুপ এই বছরে তাদের কারখানাগুলি থেকে ২০০ কর্মচারীকে ছাটাই করেছিল। শ্রমিক নেতারা দাবী

করেছিল যে বি.আই.জি.ইউ.এফ.'র সাথে শ্রমিকদের সম্পর্কের কারণেই তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে যা আজিম গ্রুপের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

আইনত, নিবন্ধিত ইউনিয়নগুলি তাদের চাহিদাগুলি মালিকদের কাছে একটি চুক্তিপত্র হিসাবে দাখিল করতে পারে এবং মালিকদের সাথে সেটা নিয়ে সমষ্টিগতভাবে দর-কষাকষিও করতে পারে। এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে কিন্তু ঘটনাগুলি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আইনটি অন্যায্য শ্রম অনুশীলনের জন্য অপরাধমূলক জরিমানা প্রদান করে, যেমন শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রয়োগের জন্য ইউনিয়ন সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা নেয়া। শ্রম সংস্থাগুলি জানিয়েছিল যে কিছু কোম্পানিতে শ্রমিকরা তাদের যৌথ দরকষাকষি অধিকার প্রয়োগ করেনি কারণ তাদের ইউনিয়নের নেতাদের অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থাপকের সাথে সমষ্টিগতভাবে তাদের অভিযোগগুলি নিয়ে দর-কাষাকষি করার ক্ষমতা নেই কিংবা তারা প্রতিশোধের মুখোমুখি হওয়ার ভয় পেয়েছিল।

আইনগুলিতে, ইউনিয়নের কার্যকলাপগুলি সংগঠিত করার সময় নিয়োগদাতাদের হস্তক্ষেপ থেকে ইউনিয়নগুলিকে রক্ষা করার বিধান অন্তর্ভুক্ত আছে; যাইহোক, বিশেষ করে, তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োগদাতারা প্রায়ই ইউনিয়নের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিল। শ্রমিক সংগঠকরা আতঙ্কিত করার তৎপরতা, অপব্যবহার, শ্রমিকদেরকে বরখাস্ত করা, এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী দ্বারা পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছিল। শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করে এরকম এন.জি.ও'গুলি অভিযোগ করেছে যে কিছু কিছু বরখাস্ত হওয়া ইউনিয়ন সদস্য এই খাতে কাজ খুঁজে পাচ্ছে না কারণ নিয়োগকারীরা তাদেরকে ব্ল্যাকলিস্টেড বা কালো তালিকাভুক্ত করে রেখেছে। বি.জি.এম.ই.এ. জানিয়েছিল যে কিছু কারখানার মালিক শ্রমিকদের সংগঠন দ্বারা হয়রানিসহ শারীরিকভাবে ভয় দেখানোর অভিযোগ করেছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে তারা কোনো পরিসংখ্যান, এবং নির্দিষ্ট কোনো উদাহরণ দিতে পারেনি।

শ্রম আইনের ২০১৩ সালের সংশোধনীর অনুযায়ী ৫০-এর বেশী কর্মচারী আছে এরকম প্রতিটি কারখানায় একটি নির্বাচিত শ্রমিক অংশগ্রহণের কমিটি (ডব্লিউ. পি.সি) থাকতে হবে। সংশোধিত বিধির সাড়া দেয়ার জন্য সরকার ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন পাশ করেছিল। ডব্লিউ পি সি নির্বাচনের জন্য নিয়মগুলিতে প্রক্রিয়াটির একটি রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (বেপজা) কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি পৃথক আইনি কাঠামো ইপিজেডের প্রায় ৪৫৮,০০০ শ্রমিকদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত ই.পি.জেড. আইন কর্মীদের কল্যাণ সমিতির (WWA) জন্য সীমিত সমষ্টিগতভাবে দর-কষাকষির অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়, যেমন সম্মিলিতভাবে দর-কষাকষির করার এবং বিরোধের সময় তাদের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার। আইনটি ই.পি.জেড.'র মধ্যে ইউনিয়ন করা নিষিদ্ধ করেছে। পূর্বের ই.পি.জেড'এ কারাদন্ডের আওতায় সব ধরণের ধর্মঘট বন্ধ করার বিধির আইনটির মেয়াদ ২০১৩ সালে শেষ হয়ে যায়, আইনটির ধর্মঘট বন্ধ করার কঠোর সীমাবদ্ধতাগুলি বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে যেমন বেপজা'র চেয়ারপার্সন, তারর বিবেচনায় জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো ধরনের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন। আইনটি ইপিজেড শ্রম ট্রাইবুনাল, আপিল ট্রাইবুনাল এবং কনসিউলেটরদের বা মীমাংসাকারী গঠন করার ব্যবস্থা প্রদান করে, তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এর পরিবর্তে আটটি শ্রম আদালত এবং একটি আপিল শ্রম আদালত ই.পি.জেড.'র মামলাগুলি শুনানি করেছিল। বেপজা'র নিজস্ব পরিদর্শন শাসন ব্যবস্থা রয়েছে যা শ্রম কাউন্সিলারদের সাথে পরিদর্শক হিসাবে কাজ করে। ইপিজেড এলাকায় ডব্লিউ.ডব্লিউ.এ. গুলির সাথে বাইরের রাজনৈতিক দল, ইউনিয়ন, ফেডারেশন বা এনজিও'গুলির সংযোগ স্থাপনের করা নিষিদ্ধ। ইপিজেড এলাকায় আইনি ধর্মঘটের কোনও প্রতিবেদন নাই।

এই বছর সরকারগুলি এবং আই.এল.ও. সাস্টেনেবিলিটি কমপ্যাক্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশটিকে ইপিজেড আইনের খসড়াসহ সমিতির স্বাধীনতার বিষয়গুলির উপর অগ্রগতি অর্জনের জন্য এবং ইউনিয়ন বিরুদ্ধ বৈষম্যমূলক আচরণের তদন্ত চালিয়ে

যেতে অনুরোধ করেছিল। জবাবে সরকার ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতিটির খসড়া তৈরি করেছিল এবং সংসদ থেকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল সংক্রান্ত শ্রম আইনের খসড়াটি প্রত্যাহার করেছিল। ইপিজেড এলাকায় অ্যাসোসিয়েশন এবং কর্মীদের সুরক্ষা অধিকারের সীমাবদ্ধতাটি বাদ রে খে জাতীয় শ্রমিক আইন ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছিল। একটি শ্রম আদালত ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বহিস্কার করা শ্রমিকদেরকে পুনর্বহাল করার আদেশ দিতে পারে কিন্তু এই অধিকার খুব কমই ব্যবহার করা হয়েছে।

সরকার সবসময় প্রযোজ্য আইনগুলি কার্যকরভাবে বা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করেনি। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম আইন একটি শ্রম আদালত দ্বারা সমঝোতা, সালিস, এবং বিরোধ নিস্পত্তির জন্য একটি প্রক্রিয়া স্থাপন করে। এটা আরও প্রতিষ্ঠিত করে যে, একটি যৌথ-দর-কষাকষির ক্ষেত্রে ইউনিয়নের শ্রমিকরা যদি কোনো নিষ্পত্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের ধর্মঘট করার অধিকার থাকবে। কয়েকটি ধর্মঘট কষ্টসাধ্য আইনি প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করে করা হয়েছিল তবে ধর্মঘট বা কর্মস্থল ত্যাগ কর্‌টি প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছিল।

২০১৩ সালে আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা বৃদ্ধি করা হয়েছিল, বাস্তবায়নের বিধিগুলি প্রবর্তনের দ্বারা সক্রিয় করা হয়েছিল। প্রথম বার লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ জরিমানা ছিল ২৫,০০০ টাকা ($৩১৩); দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য জরিমানাটি দ্বিগুণ হয়। আইনটি তিন বছর পর্যন্ত কারাবাসের জন্য অনুমতি দেয়। যদি লঙ্ঘনের কারণে কারও মৃত্যু হয় তবে আইনটি ১০০,০০০ টাকা ($১,২৫০) পর্যন্ত জরিমানা, চার বছরের কারাদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারে। প্রশাসনিক ও বিচারিক আপিলগুলি দীর্ঘ বিলম্বের বিষয় ছিল।

খ.জোর পূর্বক, বা বাধ্যতামূলক শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা

আইনটিতে সব ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ। জোরপূর্বক বা বন্ডেড শ্রম অপরাধের জন্য জরিমানা ৫ থেকে ১২ বছরের কারাদন্ড এবং জরিমানা যা ৫০,০০০

($ ৬২৫) টাকার কম হবে না। জোরপূর্বক শ্রমবিষয়ক আইনগুলি পরিদর্শনের প্রক্রিয়াগুলি কার্যকরিভাবে কাজ করে নি। সম্পদ, পরিদর্শন এবং প্রতিকারের প্রচেষ্টা অপর্যাপ্ত ছিল। আইনটি এটাও নির্দেশ করে যে জোরপূর্বক শ্রমের শিকার শ্রমিকরাও যাতে মানব পাচারের শিকারদের মত আশ্রয় এবং অন্যান্য সুরক্ষামূলক পরিসেবা গুলি পেতে পারে।

চাকরির প্রস্তাব দিয়ে বিদেশে কাজ করার জন্য জালিয়াতির নিয়োগপত্র দিয়ে কয়েকজন ব্যক্তিকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল, পরবর্তীতে বিদেশে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে শোষন করা হয়েছিল, তাদেরকে ঋণ দাসত্বের শর্তে কাজ করানো হয়েছিল এবং শ্রমের জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। অনেক অভিবাসী শ্রমিকরা নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে গিয়ে তাদেরকে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়েছিল , আইনগতভাবে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলি তাদের উপর এটা চাপিয়ে দেয়, এরা ছিল, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি হয়ে কাজ করা লাইসেন্সহীণ অবৈধ সাব এজেন্টগুলি।

জোরপূর্বক শ্রমের এবং গৃহস্থালি সেবার কাজের ঘটনাগুলির ব্যাপারে জানানো হয়েছিল, প্রধানত গ্রাম এলাকায়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদেরকে বাধ্যতামূলক দাসত্ব , এবং বন্ডযুক্ত শ্রমে বাধ্য করা হয়েছিলো, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল সীমাবদ্ধ চলাফেরা সুযোগ, মজুরিহীন শ্রম, হুমকি দিয়ে শ্রম করানো, এবং শারীরিক বা যৌন কাজে ব্যবহার করা (অধ্যায় ৭.গ দেখুন)।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানব পাচারের প্রতিবেদনটি নিম্নের ওয়েব সাইটটিতে দেখুন - www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

গ. নিষিদ্ধ শিশু শ্রম, এবং কর্মসংস্থানের জন্য ন্যূনতম বয়স

আইন শিশুদের কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিধানটি নির্ভর করে কাজের ধরন এবং সন্তানের বয়সের উপর। কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর এবং বিপজ্জনক কাজের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ১৮। আইনটি কিছু ব্যতিক্রমের জন্য অনুমতি দেয়,

১২ বা ১৩ বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে দিয়ে সীমিত ধরণের হালকা কাজের জন্য অনুমতি দিয়েছে।

অপ্রাপ্তবয়স্করা কারখানাতে প্রতি দিন ৫ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা কিংবা অন্যান্য ধরনের কাজের জায়গায় প্রতি দিন সাত ঘন্টা করে সপ্তাহে ৪২ ঘন্টা করতে পারবে। আইন অনুযায়ী প্রতিটি শিশুকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে যোগদান করতেই হবে।

শ্রম মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি বড় শহরগুলির অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল, এবং কর্তৃপক্ষ রপ্তানিযোগ্য পোশাক ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ খাতের বাইরে শিশুশ্রমের এই আইনটি খুব কমই প্রয়োগ করেছিল। কৃষি এবং অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাত, যেখানে সরকারি তত্ত্বাবধানে কোনোও নজরদারী নাই সেখানে বিপুল সংখ্যক শিশু নিয়োগ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৬ বর্ষের শিশু শ্রমের উপর জাতীয় পরিকল্পনার বা ন্যাশনাল প্ল্যানের আওতায় জাতীয় শিশু শ্রম কল্যাণ পরিষদকে শিশু শ্রম পর্যবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

যদিও, শুরু থেকে এই পর্যন্ত পরিষদটি কেবল মাত্র দুইবার মিলিত হয়েছিল। সরকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু সুরক্ষার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য অনুমতি দিয়েছে যাতে একটি বৃহৎ পরিসরে শিশুদের বিরুদ্ধে লঙ্ঘনগুলির জন্য সাড়া দেয়া যায়, এতে অন্তর্ভুক্ত আছে শিশুশ্রম, সরকারি হস্তক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করা এবং একটি সুপারিশ করার প্রক্রিয়া গড়ে তোলা।

৫০০০ টাকার কম ($৬৩) নাম মাত্র জরিমানা সহ আইনটি শিশুশ্রমের আইন লঙ্ঘণের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। লঙ্ঘনগুলি কমিয়ে আনার জন্য এই জরিমানা বা শাস্তিগুলি পর্যাপ্ত নয়। যেসব নিয়োগদাতা গৃহে কাজ করা ভৃত্য বা চাকরদেরকে নির্যাতন করেছে সরকার মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করেছে।

গত অক্টোবর মাসে সরকার শিশু শ্রমের ওপর একটি গবেষণায় ফলাফল প্রচার করে, যাতে দাবি করা হয় যে ৮০ শতাংশ শিশু কর্মী শহুরে এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ চাকরিতে জড়িত ছিল। পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন, মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন গবেষণাটি বলেছে যে ২৪ শতাংশ শিশু শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মুখোমুখি হয়েছিল, এবং ২৬ শতাংশ শিশু অপরিস্কার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে কাজ করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে কর্মদিবসের প্রতি আট ঘণ্টায় একজন শিশু শ্রমিক গড়ে ১০০ টাকা ($ ১.২৩) উপার্জন করেছিল।

অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং গৃহকর্মের ক্ষেত্রে শিশু শ্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। ঢাকার বস্তী এলাকায় ২৭০০ পরিবারের একটি জরিপের উপর ভিত্তি করে ২০১৬ সালে একটি বিদেশী উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের জরিপের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ১৫ শতাংশ শিশুই স্কুল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং পুরো সময় বা পূর্ণ-কালীন অর্থাৎ ফুল টাইম শ্রমে জড়িত থেকেছিল। এই শিশুরা জাতীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত ৪২-ঘন্টা সীমা অতিক্রম করে কাজ করছিল।

আই.এল.ও'র মতে, ছেলেদের জন্য প্রাথমিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ছিল কৃষি এবং মেয়েদের জন্য প্রধানত ক্ষেত্র ছিল সেবামূলক কাজগুলো। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তরুণ শক্তি, চট্টগ্রামে জাহাজ ভাঙ্গার অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে কাজ করে এমন একটি এন.জি.ও'র মত অনুযায়ী জাহাজ ভাঙার কর্মীদের মধ্যে ১১ শতাংশ শ্রমিক'ই ১৮ বছরের কম বয়সী ছিল। এন.জি.ও'গুলি যেমন 'শিপ ব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম' তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, ছুটির দিন, এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াই দীর্ঘ সময় কাজ করেছে এবং এমনকি চুক্তিবদ্ধ হওয়া ছাড়াও তারা কাজ করেছে। এই শিল্পে ২০১৫ সালে কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিক মারা গিয়েছিল।

শিশুরা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম শিশু শ্রমের সাথে, মূলত কৃষি ক্ষেত্রের বিপজ্জনক কর্মকান্ডগুলিতে জড়িত ছিল। কৃষি কাজ করার সময় শিশুরা বিপজ্জনক

সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে, ভারী ভার বহন করে এবং ক্ষতিকর কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করার ঝুঁকি নিচ্ছে। শিশুরা প্রায়ই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজ করেছে , চরম তাপমাত্রার কাছে উন্মুক্ত থেকেছে এবং তীক্ষ্ম ধারলো যন্ত্র সরঞ্জামগুলি থেকে উচ্চ হারে জখম হওয়ার শিকার হয়েছে। শিশুরা পাথর ও ইট ভাঙ্গার কাজে, রঞ্জন শিল্পে, কামারদেরকে সহায়তা করা এবং নির্মাণ কাজের মতো বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপে কাজ করেছে। শুঁটকি মাছ শিল্পে শিশুদেরকে দিয়ে বাধ্যশ্রম করানো হয়েছিল, যেখানে শিশুদের ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের কাছে উন্মুক্ত থাকতে হয়েছিল, বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করতে হয়েছিল এবং তাদেরকে দিয়ে দীর্ঘ ঘন্টা কাজ করান হয়েছিল। শহর এলাকায় শিশুরা রাস্তায় রিকশা ঠেলা, আবর্জনা সংগ্রহ করা, পুনর্ব্যবহার শিল্পে, বিক্রেতার কাজ, ভিক্ষা করা, যানবাহন মেরামতের কাজ এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁয় কাজ করেছে। এই শিশুদের শোষণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল, উদাহরণস্বরূপ, জোরপূর্বক ভিক্ষা করানো, মাদক চোরাচালান বা মাদক বিক্রি করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

শিশুরা প্রায়ই অনিবন্ধিত পোশাক কারখানাগুলিতে, সড়ক পরিবহনে, উৎপাদনে এবং পরিষেবামূলক শিল্প সহ অনানুষ্ঠানিক খাতগুলিতে কাজ করেছিল।

নিকৃষ্টতম শিশু শ্রমের সবচেয়ে খারাপ ধরণগুলির উপর শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত ফলাফলগুলি উল্লেখিত ওয়েব সাইটে দেখুন - www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/

ঘ. কর্মসংস্থান এবং পেশা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈষম্য

শ্রম আইন নারী-পুরুষ বা অক্ষমতার ভিত্তিতে মজুরি বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু এটি নারী-পুরুষ ভিত্তিতে, অক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান, বর্ণ, যৌন অভিযোজন, বা অনুরূপ কারণের ভিত্তিতে অন্যান্য বৈষম্যগুলি নিষিদ্ধ করে না। দেশের সংবিধান ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বা জন্মস্থান ভিত্তিতে রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিকূল বৈষম্য নিষিদ্ধ করে

এবং স্পষ্টভাবে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে এইসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে; এটি পিছিয়ে থাকা বা অসুবিধায় থাকা জনগোষ্ঠীর উপকারের জন্য সরকার ইতিবাচক কর্মসূচী বা পদক্ষেপ নেয়।

নিম্ন মজুরির তৈরি পোষাক শিল্পের ক্ষেত্রটিতে প্রচলিতভাবে মহিলাদের জন্য চাকুরির জন্য বড় সুযোগ করে দিয়েছে। পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা প্রতিনিধিত্ব করেন, যা মোট পরিসংখ্যান অনুসারে মোট তৈরি পোশাক শিল্পের ৫৬ শতাংশেরও বেশি; তবে পরিসংখ্যানটি তথ্য উপাত্তের অভাবের কারণে অনেক পার্থক্য ছিল। আই.এল.ও. অনুমান করে যে তৈরি পোষাক শিল্পের ৬৫ শতাংশ শ্রমিকই নারী। মোট শ্রম শক্তির সিংহ ভাগ নারীদের প্রতিনিধিত্ব হওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার অবস্থানগুলিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব অনেক কম ছিল, এবং একই ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রেও সাধারণত পুরুষ সমতুল্যদের তুলনায় তাদের উপার্জন কম হোতো।

এন্ড্রিয়াস মেনজেল (সেন্টার ফর ইকনমিক রিসার্চ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন-ইকনমিকস ইনস্টিটিউট) এবং ক্রিস্টোফার উড্রুফ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি) দ্বারা গোটা বছরে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে শ্রমিক উৎপাদনশীলতা নিয়ন্ত্রণের পরও নারীরা রপ্তানি-ভিত্তিক গার্মেন্টস কারখানাগুলিতে কম মজুরি অর্জন করেছে। গবেষণার মতে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মজুরির ব্যবধানটি দক্ষতা নিয়ন্ত্রণের পরেও অব্যাহত ছিল, যা পুরুষ শ্রমিকদের জন্য উচ্চতর গতিশীলতার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীরা যৌন হয়রানি সহ কারখানাগুলিতে নির্যাতিত হয়েছিল।

কিছু ধর্মীয়, জাতিগত, এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের কথা জানিয়েছেন, বিশেষ করে বেসরকারি খাতে (অধ্যায় ৬ দেখুন)।

ঙ. গ্রহণযোগ্য কর্মস্থলের অবস্থা

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড একটি খাতের পর খাত ভিত্তিতে সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি্র হার নির্ধারণ করেছে। বোর্ড যে কোনও সময়ে মিলিত হওয়ার জণ্য আহ্বান

করতে পারে এবং শিল্পের পর শিল্প এই ভিত্তিতে একটা মজুরি কাঠামো প্রদান করার মত সুবিধাগুলির নির্ধারণ করার জন্য ত্রিপক্ষীয় ফোরামে কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর পর মিলিত হওয়ার কথা। আইন অনুযায়ী সরকার নিয়োগকারী এবং কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর সরকারীভাবে ঘোষণার মাধ্যমে বেতন কাঠামো পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। বস্ত্র শিল্পে বোর্ড ২০১৩ সালে ৫,৩০০ টাকা ($৬৬) ন্যূনতম মাসিক মজুরি নির্ধারণ করেছিল। পোশাক খাতের মজুরি প্রায়ই ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশি হয় এবং ইপিজেড'র মজুরি সাধারণ মজুরি মাত্রা থেকে বেশি হয় - যা প্রতি মাসে ৫,৫০০ টাকা ($ ৭০), বেপজা অনুযায়ী। এর মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ছিল চা প্যাকেজিংয়ের জন্য, এই মজুরিটি ২০১৩ সালে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে প্রতি দিন ৬৯ টাকা ($ ০.৮৬) হারে নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্ধারণ করা ন্যূনতম মজুরিগুলি কোনও শহুরে বাসগৃহে বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত মানদণ্ড প্রদান করে না। ন্যূনতম মজুরিটি মুদ্রাস্ফীতির সূচক অনুযায়ী করা হয়নি (যা বার্ষিক প্রায় ৭ থেকে ৮ শতাংশ) কিন্তু বোর্ড মাঝে মাঝে কিছু কিছু খাতে জীবিকার জন্য খরচের সাথে মজুরির সমন্বয় করেছে।

আইন অনুযায়ী একটি আদর্শ কার্য দিবস আট ঘন্টায় হয়। একটি সাধারণ মাণের কার্য সপ্তাহ ৪৮ ঘণ্টার হয়, কিন্তু সেটাকে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে, যা মূলত অতিরিক্ত কাজের সময় হিসাবে ধরা হবে এবং যা প্রাপ্ত মূল মজুরির দ্বিগুণ হয়। অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না। শ্রমিকদের এক ঘন্টা বিশ্রাম থাকতে হবে যদি তারা দিনে আট ঘণ্টার বেশী সময় কাজ করে এবং একই দিনে প্রতি পাঁচ ঘন্টার বেশী কাজ করার জন্য আধা ঘণ্টা বিশ্রাম পাবে। কারখানার শ্রমিকদের প্রতি সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকার কথা। দোকান কর্মীরা প্রতি সপ্তাহে এক এবং একের-অর্ধেক দিন বন্ধ পাবে। আইনটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানদণ্ড প্রবর্তন করে এবং আইনের সংশোধনী দ্বারা বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করে। আইন বলছে যে প্রতিটি কর্মীকে বছরে পূর্ণ বেতন সহ অন্তত ১১ টি উৎসব ছুটির দিনের অনুমতি দিতে হবে। উৎসবের জন্য দিনগুলি এবং তারিখ নিয়োগকর্তা দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

শ্রম আইনের বাস্তবায়নকারী বিধানগুলি কারখানাগুলিতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটি গঠন করার প্রক্রিয়ার রূপরেখায় দিয়েছে এবং সরকার প্রতিবেদন দিয়েছে যে গত জুলাই পর্যন্ত প্রায় ২,১৭৪ টি নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলিতে ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন বা কারখানার ডব্লিউ.পি.সি. (WPC) দ্বারা মনোনীত শ্রমিক উভয়ই অন্তর্ভুক্ত আছে। যেখানে কোন ইউনিয়ন বা WPC নেই, সেখানে শ্রম মন্ত্রণালয় তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের জন্য কর্মীদের মধ্যে একটি নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

সরকার সর্বনিম্ন মজুরি, ঘন্টা হিসাবে কাজ এবং কোনো ক্ষেত্রেই পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের মানের ব্যাপারে আইনগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। যদিও গার্মেন্টস শিল্পের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করাতে কিছু কিছু কারখানাতে বিধানগুলি মেনে চলার ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সম্পদ, পরিদর্শণ এবং প্রতিকারগুলি সাধারনভাবে পর্যাপ্ত ছিল না এবং লঙ্ঘনের শাস্তিটিও লঙ্ঘনগুলি বন্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কাছে সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে পরিদর্শন করার এবং প্রতিকারের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বা ব্যবস্থা ছিলনা এবং মন্ত্রণালয়ের আদালতে মামলা দায়ের না করে সরাসরি নিয়োগকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার ক্ষমতাও ছিল না। মন্ত্রণালয় কিছুটা হলেও তার কর্মচারী এবং প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা ও সংস্থার পরিদর্শন বিভাগটি জানিয়েছে যে তাদের কাছে ৩১১ জন সক্রিয় পরিদর্শক রয়েছে যার মধ্যে ২৬৯ জনকে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে পরার পর ২০১৩ সালে নিয়োগ করা হয়েছে।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে ১১৩৮ জন শ্রমিক নিহত হয়েছিল এবং ২ হাজারেরও বেশি শ্রমিক আহত হয়েছিল। পতনের পর বেসরকারি কোম্পানি, বিদেশী সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা মোট ৩,৭৮০ টি পোশাক কারখানা পরিদর্শনের জন্য সরকারের সাথে কাজ করেছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে জুলাই পর্যন্ত মানবজীবনের ঝুঁকির প্রেক্ষিতে ২৮১ টি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কারখানা

নিরাপত্তার অবস্থার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নিতে শুরু করে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, যার মধ্যে পর্যাপ্ত অর্থায়ন পাওয়ার ব্যর্থতাও রয়েছে। দুইটি বেসরকারি ক্রেতার উদ্যোগ - এ্যালায়েন্স এবং অ্যাকর্ড, এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ২৪০০ টি কারখানার প্রাথমিক অগ্নি ও নিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনা করে কিন্তু এই উদ্যোগের বাইরে গার্মেন্টস কারখানাগুলির ব্যাপারে সরকারি তত্ত্বাবধান ও প্রয়োগ কর্তিপক্ষের উদ্যেগ ছিল সীমিত। এই উদ্যোগগুলি কেবল আনুষ্ঠানিক তৈরি পোশাক কারখানার জন্য নেয়া হয়েছিল, যেখানে হাজার হাজার অনানুষ্ঠানিক পোশাক কারখানা এবং পোশাক নয় এরকম অন্যান্য কারখানাগুলিকে যথাযথ তত্ত্বাবধান ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। বয়লার, বা রাসায়নিক পদার্থ সংক্রান্ত বিস্ফোরণগুলি অগ্নিহীণ শিল্প দুর্ঘটনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বাড়িয়ে দিয়েছিল। গত ২০ শে সেপ্টেম্বর ঢাকা অঞ্চলের শহরতলী মুন্সীগঞ্জের আইডিয়াল টেক্সটাইল মিলের একটি অগ্নিকাণ্ডে ছয়জন কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে কারখানা ভবনের প্রথম তলায় অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় যেখানে রাসায়নিক দ্রব্যগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানার বিরুদ্ধে আদালতের মামলা ছিল এবং সেই অভিযোগে অন্য আরও ৪০ জনের নামও ছিল, সেখানে গত ২০১৬ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া একটা হত্যা মামলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত ২৭ শে আগস্ট, রানা তার ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাব একটি দূর্ণীতি বিরোধী কমিশনের কাছে ঘোষণা করতে ব্যর্থ হওয়াতে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন। রানা এবং অন্যদের বিরুদ্ধে হত্যার বিচার চলতে থাকে।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে চেয়ারম্যান মাহমুদা আক্তার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেলোয়ার হোসেনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার পর, ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে তাজরীন ফ্যাশনস অগ্নিকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে একটি মামলা শুরু হয়। সংবাদ মাধ্যমগুলি জানিয়েছে যে বছরের শেষে বিচারটি থেমে গেছে।

শ্রমিকদের দলগুলির মতে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের মান যথেষ্ট ছিল এবং আরও অনেক কারখানা এগুলোকে মেনে চলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। আইনটি অমান্য বা অগ্রাহ্য করার জন্য সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা ($৩১৩) জরিমানা প্রদান করে কিন্তু এতে আইনটি লঙ্ঘন করা বন্ধ হয়নি ।

কাজের ঘন্টাগুলির আইনী সীমা নিয়মিতভাবে লঙ্ঘন করা হয়। আর.এম.জি. সেক্টরে নিয়োগদাতারা প্রায়ই সময় সীমার মধ্যে রপ্তাণী করার জন্য শ্রমিকদেরকে দিয়ে দিনে নির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে ১২ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় কাজ করিয়ে নেয় কিন্তু তারা সবসময় তাদের সময়ের জন্য শ্রমিকদেরকে সঠিকভাবে মজুরী দেয়নি। সলিডারিটি সেন্টারের মতে শ্রমিকরা প্রায়ই স্বেচ্ছায় আইনী সময়সীমা ছাড়াও অতিরিক্ত সময় কাজ করেছে। নিয়োগকারীরা প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের বেতন প্রদানে বিলম্ব করেছিল বা পূর্ণ ছুটির সুবিধা দিতে অস্বীকার করেছিল। শ্রম মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে ওভারটাইম বা অতিরিক্ত সময় কাজ সম্পর্কিত লঙ্ঘনের কোনো প্রতিবেদন দেয়নি।

বৃহত্তর অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলির উপর কিছু নির্ভরযোগ্য শ্রমিকের পরিসং খ্যান পাওয়া যায়, যেখানে অধিকাংশ নাগরিক কাজ করে কিন্তু এই খাতে শ্রম আইনগুলি প্রয়োগ করা খুব কঠিন ছিল। বি.বি.এস. আয়োজিত ২০১০'এর শ্রম শক্তির জরিপের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে অনানুষ্ঠানিক খাতটি দেশের ৫৬.৭ মিলিয়ন শ্রমিকের মধ্যে ৪৭.৩ মিলিয়ন শ্রমিকের নিয়োগ দিয়েছিল।